অধ্যায় ৬

মানব শারীরতত্ত্ব : বর্জ্য ও নিষ্কাশন
Human Physiology : Wastes & Elimination

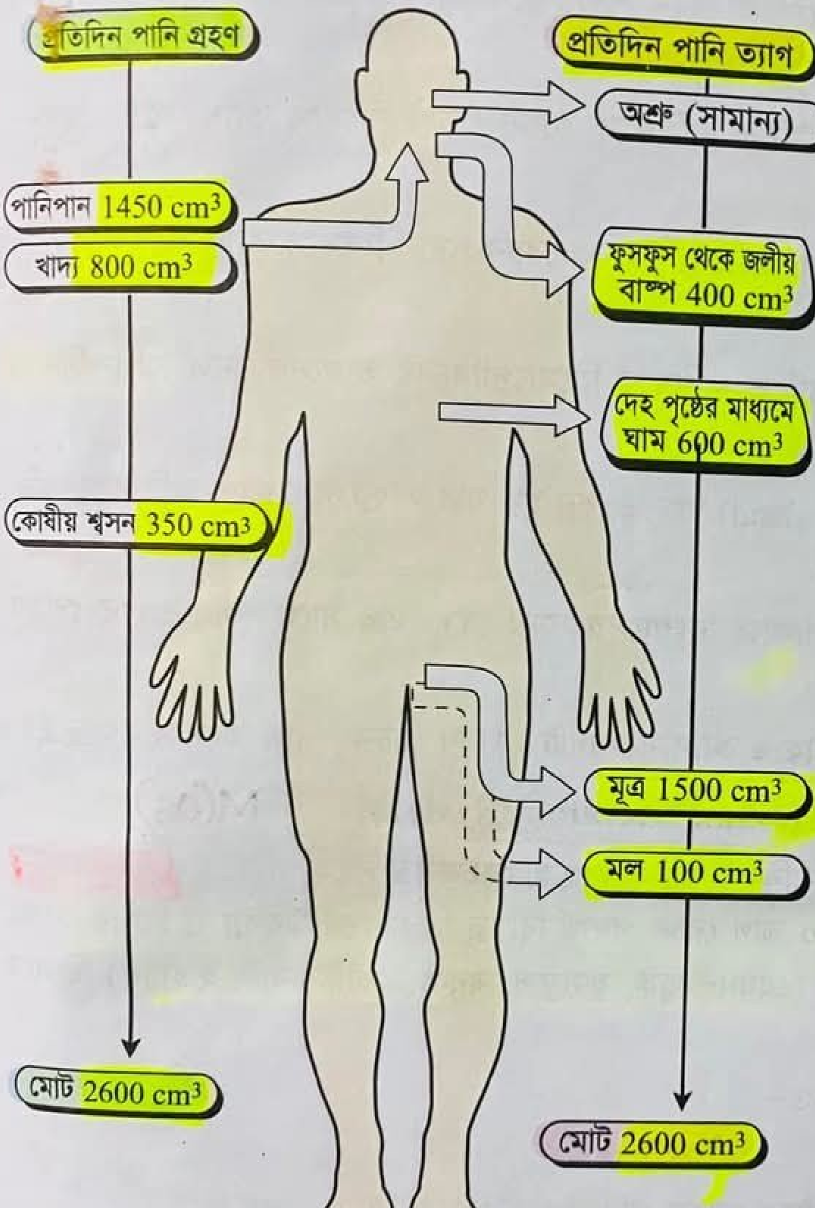

Daily water loss and water gain by the human body
Ref. Biological Science. By-D.J. Taylor & N.P.O Green

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- বৃক্ক
- ইউরেটার
- নেফ্রন
- রেনাল করপাসল
- বোম্যানস ক্যাপসুল
- গ্লোমেরুলাস
- আল্ট্রাফিল্ট্রেশন
- গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট
- হেনলির লুপ
- প্রক্সিমাল নালিকা
- ডিস্টাল নালিকা
- অর্নিথিন চক্র
- টিউবিউলার পুনঃশোষণ
- টিউবিউলার ক্ষরণ
- মূত্র
- ইউরোক্রোম
- অসমোরেগুলেশন
- অ্যালডোস্টেরন
- ডায়ালাইসিস
- ক্যাথেটার

অপচিতিমূলক বিপাক (catabolic metabolism) এর ফলে দেহে উৎপন্ন নাইট্রোজেনঘটিত দূষিত পদার্থকে **রেচন পদার্থ** বলে। **যে প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেনঘটিত দূষিত পদার্থ দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয় তাকে রেচন** (excretion) **বলে** এবং যে তন্ত্রের মাধ্যমে এসব বর্জ্য দেহ থেকে অপসারিত হয় তাকে বলা হয় **রেচন/ ইউরিনারি/ রেনাল তন্ত্র** (excretory/ urinary/ renal system)। মানুষের প্রধান রেচন পদার্থ হচ্ছে অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ইউরোক্রোম ইত্যাদি এবং প্রধান রেচন অঙ্গ হলো **বৃক্ক**। এ অধ্যায়ে বৃক্কের গঠন, কাজ ও এর জটিলতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব	পাঠ পরিকল্পনা	
বৃক্কের গঠন ও কাজের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন	পাঠ ১	মানুষের রেচনতন্ত্র
রেচনের শারীরবৃত্তের ব্যাখ্যা	পাঠ ২	রেচনের শারীরবৃত্ত
মানব শরীরে রেচন ও অসমোরেগুলেশনে বৃক্কের কার্যক্রমের যথার্থতা মূল্যায়ন	পাঠ ৩	বৃক্কের ভূমিকা
বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকলের লক্ষণ ও ঐ মুহূর্তে করণীয়	পাঠ ৪	বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল, লক্ষণ ও করণীয়
রক্ত ও মূত্রে হরমোনের ক্রিয়ার বিশ্লেষণ	পাঠ ৫	হরমোনাল ক্রিয়া
ব্যবহারিক : বৃক্কের অনুচ্ছেদ শনাক্তকরণ ও চিত্র অঙ্কন	পাঠ ৬	ব্যবহারিক : বৃক্কের অনুচ্ছেদের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ

প্রাণিদের বিভিন্ন প্রকার বর্জ্য পদার্থ (Different Types of Waste Products of Animals)

১. **নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ বা রেচন পদার্থ** (Nitrogenous Compound or Excretory Products) : ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, অ্যামোনিয়া, প্রোটিন, নিউক্লিক এসিড যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড থেকে উৎপন্ন হয়। রেচন পদার্থ বিভিন্ন প্রাণীতে নিচে বর্ণিত তিন ধরনের হয়–

   ক. **ইউরিওটেলিক (Ureotelic)** :এসব প্রাণী **ইউরিয়াকে** রেচন পদার্থরূপে ত্যাগ করে। যেমন– মানুষসহ কিছু স্থলজ ও সামুদ্রিক প্রাণী।

   খ. **ইউরিকোটেলিক (Uricotelic)** :এসব প্রাণী **ইউরিক এসিডকে** রেচন পদার্থ হিসেবে ত্যাগ করে। যেমন– পতঙ্গ, সাপ, টিকটিকি, পাখি।

   গ. **অ্যামোনোটেলিক (Ammonotelic)** :এসব প্রাণী **অ্যামোনিয়াকে** রেচন পদার্থ হিসেবে ত্যাগ করে। যেমন– হাইড্রা, কেঁচো, কিছু মাছ।

২. **পিত্তরঞ্জক** (Bile Pigment) : যকৃতের পুরাতন লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনের ভাঙ্গনের ফলে বিলিরুবিন ও বিলিভার্ডিন নামক পিত্তরঞ্জক তৈরি হয়।

৩. **ঘাম** (Sweat) : ত্বকে অবস্থিত ঘর্মগ্রন্থিতে (sweat gland) ঘাম উৎপন্ন হয় যার সাহায্যে দেহের অতিরিক্ত পানি, খনিজ লবণ এবং অল্প পরিমাণ ইউরিয়া নির্গত হয়।

৪. **কার্বন ডাইঅক্সাইড** : সামান্য বিপাকীয় পানি বাষ্পাকারে নিঃশ্বাসের সময় CO_2- এর সাথে ফুসফুস হতে দেহের বাইরে নির্গত হয়।

৫. **লবণ জাতীয় দ্রব্য** : অন্ত্রে উৎপন্ন কিছু পরিমাণ লৌহ ও ক্যালসিয়ামঘটিত লবণ রেচন পদার্থ হিসেবে উৎপন্ন হয়।

মানুষের রেচনতন্ত্র (Human Excretory System)

M(06)

রেচন পদার্থ নিষ্কাশনের জন্য মানবদেহে একটিমাত্র সুনির্দিষ্ট তন্ত্র রয়েছে যা **রেচনতন্ত্র** নামে পরিচিত। এর মাধ্যমেই শতকরা ৮০ ভাগ রেচন পদার্থ নিষ্কাশিত হয়। বাকি ২০ ভাগ রেচন পদার্থ বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে উৎপন্ন ও বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয়। এসব অঙ্গ **সহকারী রেচন অঙ্গ** (যেমন– ত্বক, ফুসফুস, যকৃত, পৌষ্টিকনালি ইত্যাদি) হিসেবে কাজ করে।

মানুষের রেচনতন্ত্র নিম্নলিখিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত–

১. **একজোড়া বৃক্ক** :এতে মূত্র তৈরি হয়।

২. **একজোড়া রেচননালি বা ইউরেটার** :বৃক্ক থেকে মূত্রকে পরিবহন করে মূত্রথলিতে প্রেরণ করে। D(17)

৩. **একটি মূত্রথলি** :মূত্রকে সাময়িকভাবে জমা রাখে এবং

৪. **একটি মূত্রনালি** :মূত্রথলি থেকে মূত্রকে দেহের বাইরে নিক্ষেপ করে।

১. **বৃক্ক (Kidney)** : বক্ষপিঞ্জরের ঠিক নিচে উদর গহ্বরের কটি অর্থাৎ কোমর অঞ্চল (lumbar region)-এ মেরুদণ্ডের দুপাশে একটি করে মোট দুটি বৃক্ক থাকে। বৃক্কের উপরের প্রান্ত দ্বাদশ থোরাসিক কশেরুকার নিচে এবং নিচের প্রান্ত তৃতীয় লাম্বার কশেরুকার উপরে অবস্থিত। উদর গহ্বরে যকৃতের অবস্থানের কারণে বাম বৃক্কটি ডান বৃক্কের তুলনায় সামান্য উপরে অবস্থিত। বৃক্ক দেখতে অনেকটা শিম বীজের মতো। এর পার্শ্বদেশ উত্তল, ভিতরের দিক অবতল।

২. **রেচন নালি বা ইউরেটার (Ureter)** :বৃক্কের পেলভিস থেকে সৃষ্টি হয়ে পৃষ্ঠউদরীয় প্রাচীর ঘেঁষে পশ্চাৎভাগে অগ্রসর হয়ে যে নালি মূত্রথলিতে উন্মুক্ত হয়েছে তাকে **ইউরেটার** বলে। প্রত্যেকটি নালি দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৫ সেন্টিমিটার। এ নালি বৃক্ক থেকে মূত্রথলিতে মূত্র পরিবহন করে।

৩. **মূত্রথলি (Urinary Bladder)** :মূত্রথলি পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট এবং ডেট্রুসর (detrusor) নামক অনৈচ্ছিক পেশি দিয়ে গঠিত একটি ত্রিকোণাকার থলি বিশেষ। এটি সঙ্কোচন প্রসারণক্ষম। মূত্রথলি ৭০০-৭৫০ মিলিলিটার মূত্র ধারণ

করতে পারে। তবে ২৮০-৩২০ মিলিলিটার মূত্র মূত্রথলিতে জমা হলেই ত্যাগের ইচ্ছা জাগে। মূত্র সাময়িকভাবে ধারণ করা ও সময়ে সময়ে নিষ্কাশন করা এর কাজ।

৪. মূত্রনালি বা ইউরেথ্রা (Urethra) : পুরুষে মূত্রথলির পশ্চাৎপ্রান্ত থেকে মূত্রনালি উৎপন্ন হয়ে লিঙ্গের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে শেষ পর্যন্ত একটি ছিদ্রের মাধ্যমে বাইরে উন্মুক্ত। প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষে এ নালির দৈর্ঘ্য ১৮–১৯ সেন্টিমিটার। নারীদেহে মূত্রনালি একটি পৃথক ছিদ্রের মাধ্যমে দেহের বাইরে উন্মুক্ত এবং এর দৈর্ঘ্য মাত্র ৩.৫–৪ সেন্টিমিটার। মূত্র দেহের বাইরে নিষ্কাশন করা এর প্রধান কাজ। তাছাড়া পুরুষের ইউরেথ্রার মাধ্যমে বীর্য দেহের বাইরে নির্গত হয়।

চিত্র ৬.১ : মানুষের রেচনতন্ত্র

বৃক্কের গঠন ও কাজ

বাহ্যিক গঠন : প্রতিটি বৃক্ক নিরেট, চাপা দেখতে অনেকটা শিম বীজের মতো এবং কালচে লাল রংয়ের। একটি পরিণত বৃক্কের দৈর্ঘ্য ১০–১২ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ৫–৬ সেন্টিমিটার এবং স্থূলত্ব ৩ সেন্টিমিটার। এককেটির ওজন পুরুষে ১৫০–১৭০ গ্রাম এবং নারীদেহে ১৩০–১৫০ গ্রাম। বৃক্কের বাইরের দিক উত্তল ও ভিতরের দিক অবতল। অবতল অংশের ভাঁজকে **হাইলাম** (hilum) বলে। হাইলামের মধ্য দিয়ে ইউরেটার ও রেনাল শিরা বহির্গত হয় এবং রেনাল ধমনি ও স্নায়ু বৃক্কে প্রবেশ করে। সম্পূর্ণ **বৃক্ক ক্যাপসুল** (capsule) নামক তন্তুময় যোজক টিস্যুর সুদৃঢ় আবরণে বেষ্টিত।

অন্তর্গঠন : বৃক্কের লম্বচ্ছেদে তিনটি সুস্পষ্ট অংশ দেখা যায় : বাইরে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত গাঢ় অঞ্চলটি **কর্টেক্স** (cortex), মধ্যখানে হালকা লাল রঙের **মেডুলা** (medulla) এবং ভিতরে সাদাটে **পেলভিস** (pelvis)।

বৃক্কের সর্ববহিঃস্থ ও শক্ত তন্তুময় যোজক টিস্যুতে এবং অসংখ্য রেনাল করপাসল (খালি চোখেও দেখা যায়) ও নেফ্রনের অংশবিশেষ নিয়ে **কর্টেক্স** গঠিত।

চিত্র ৬.২ : বৃক্কের অন্তর্গঠন

কর্টেক্সের নিচে হালকা লাল রঙের মেডুলা অংশ ৮–১৮টি পিরামিড আকৃতির অংশ নিয়ে গঠিত। এগুলো **রেনাল পিরামিড** (renal pyramid)। নেফ্রনের নালিকাময় অংশ ও রক্তবাহিকা নিয়ে এককেটি পিরামিড নির্মিত হয়। পিরামিডের গোড়া থাকে কর্টেক্সের দিকে, আর ১০-২৫টি ছিদ্রযুক্ত চূড়া বা **প্যাপিলা** (papilla) থাকে রেনাল পেলভিসে উন্মুক্ত। দুই রেনাল পিরামিডের কর্টেক্সের কিছু অংশ স্তম্ভের মতো মেডুলার গভীরে প্রবেশ করেছে। এগুলোকে **রেনাল কলাম** (renal column) বলে।

বৃক্কের অভ্যন্তরে অবস্থিত ইউরেটারের অংশটি উপর দিকে ফানেলের মতো প্রসারিত অংশে পরিণত হয়ে **রেনাল পেলভিস** (renal pelvis) গঠন করেছে। প্রশস্ত পেলভিসটি উপর দিকে কয়েকটি শাখা-প্রশাখায় রূপ

চিত্র ৬.৩ : মানুষের রেচনতন্ত্র (চিত্রানুগ)

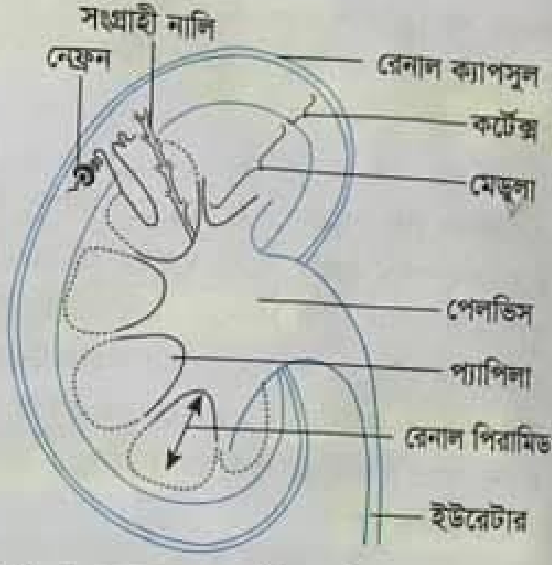

চিত্র ৬.৪ : লম্বচ্ছেদে একটি বৃক্ক (চিত্রানুগ)

নিয়েছে। এর মধ্যে ২-৩টি হচ্ছে প্রধান শাখা যা **মেজর ক্যালিক্স** (major calyx) নামে পরিচিত। মেজর ক্যালিক্স বিভক্ত হয়ে মোট ৮–১৪টি **মাইনর ক্যালিক্স** (minor calyx) সৃষ্টি করে। বৃক্কে মূত্র সৃষ্টি হলে প্রথমেই তা রেনাল প্যাপিলা হয়ে মাইনর ক্যালিক্সে প্রবেশ করে। এখান থেকে মূত্র মেজর ক্যালিক্স হয়ে রেনাল পেলভিস অতিক্রম করে ইউরেটারে বাহিত হয়। ক্যালিক্স, পেলভিস ও ইউরেটারের প্রাচীরে এমন এক ধরনের সংকোচনশীল উপাদান থাকে যার প্রভাবে মূত্র মূত্রথলির দিকে ধাবিত হয়।

বৃক্কের কাজ : মূত্র উৎপাদন বৃক্কের প্রধান কাজ হলেও এটি নিম্নলিখিত বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

1. **রক্তের পরিশোধন** : বৃক্ক দেহের বিপাকের ফলে উৎপন্ন বর্জ্যপদার্থগুলো, যেমন-ইউরিক এসিড, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি মূত্র সৃষ্টির মাধ্যমে দেহ থেকে বের করে দেয়, ফলে রক্ত বর্জ্যমুক্ত হয়ে পরিশোধিত হয়।
2. **দেহে পানির সমতা বজায় রাখা বা অসমোরেগুলেশন** : দেহে পানির পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি হলে বৃক্ক বেশি মূত্র তৈরি করে আবার পানির ঘাটতি থাকলে কম মূত্র সৃষ্টির মাধ্যমে বৃক্ক দেহে পানির সমতা বজায় রাখে।
3. **অন্যান্য পদার্থের অপসারণ** : বৃক্ক থেকে বিভিন্ন টক্সিক পদার্থ, ভেষজ পদার্থ, রঞ্জক, অতিরিক্ত ভিটামিন, ওষুধ ও হরমোন বহিষ্কৃত হয়; বৃক্কের মাধ্যমে রক্ত থেকে অতিরিক্ত চিনি ও অ্যামিনো এসিড অপসারিত হয়।
4. **অম্ল ও ক্ষারের সমতা বজায় রাখা বা pH নিয়ন্ত্রণ** : বৃক্ক দেহের খনিজ লবণ ও বাইকার্বনেটের মাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অম্ল-ক্ষার সমতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।
5. **লবণের সাম্যতা নিয়ন্ত্রণ** : বৃক্ক রক্তের সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি খনিজ লবণের সাম্যতা নিয়ন্ত্রণ করে।
6. **অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণ** : বৃক্ক দেহে রক্ত ও কোষ-টিস্যুর অভিস্রবণিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
7. **রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ** : দেহের পানির সমতা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, বিভিন্ন হরমোনের সাহায্যে বৃক্ক রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণ করে।
8. **রক্তের উপাদান নির্দিষ্ট রাখা** : বৃক্ক রক্তের রক্তরস ও রক্তকণিকার উপাদান নির্দিষ্ট রাখে।
9. **হরমোন উৎপাদন** : বৃক্কে **এরিথ্রোপয়েটিন** (erythropoietin), **প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন** (prostagladin) এবং **অ্যানজিওটেনসিন** (angiotensin) হরমোন উৎপন্ন হয়। এরিথ্রোপয়েটিন এরিথ্রোসাইট (RBC) উৎপাদনে উদ্দীপনা জোগায়।
10. **এনজাইম ক্ষরণ** : বৃক্ক রেনিন (renin) নামক এক প্রকার এনজাইম ক্ষরণ করে যার কার্যকারিতা হরমোনের মতো।
11. **হোমিওস্ট্যাসিস (Homeostasis)** : বৃক্ক রক্ত থেকে বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় বস্তু অপসারিত করে দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবেশকে স্থিতাবস্থায় রাখে।
12. **গ্লুকোনিওজেনেসিস (Gluconeogenesis)** : দীর্ঘ সময় অনাহারে থাকলে বৃক্ক গ্লুকোনিওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় প্রোটিন ও লিপিড থেকে শর্করা উৎপাদন করে। এসময় বৃক্ক প্রায় ২০% গ্লুকোজ সরবরাহ করতে পারে।
13. **পুনঃশোষণ** : বৃক্ক দেহে পানি, গ্লুকোজ ও অ্যামিনো এসিড পুনঃশোষণের সাথে জড়িত।
14. **মজবুত হাড় ও দাঁতের গঠন** : বৃক্ক ভিটামিন-D এর কার্যকর রূপ তৈরিতে প্রধান ভূমিকা রাখে। ভিটামিন-D হাড় ও দাঁত মজবুত করে।

বৃক্কের সূক্ষ্ম গঠন (Ultra Structure of Kidney) - নেফ্রন

বৃক্কের গাঠনিক ও কার্যিক একককে নেফ্রন (nephron) বলে। মানুষের প্রত্যেক বৃক্কে ১০ লক্ষ থেকে ১২ লক্ষ নেফ্রন রয়েছে। প্রতিটি নেফ্রন প্রায় ৩ থেকে ৫ সে.মি. লম্বা। এ হিসেবে প্রত্যেক বৃক্কে নেফ্রনের নালিকাগুলো সম্মিলিতভাবে ৩৬ কি.মি. (প্রায় ২২.৫ মাইল) এরও বেশি লম্বা হবে। এর ফলে বিভিন্ন পদার্থের বিনিময় ক্ষেত্র ব্যাপক বিস্তৃত হয়েছে। বৃক্কের মাধ্যমে প্রতি মিনিটে রক্ত থেকে ১২৫ ঘন সেমি. তরল পদার্থ পরিশ্রুত হয়। প্রায় ৯৯% পানিই আবার রক্তে ফিরে যায়, সাধারণত প্রতি মিনিটে কেবল ১ ঘন সেমি. মূত্র সৃষ্টি হয়।

১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে স্যার উইলিয়াম বোম্যান (Sir Willium Bowman) প্রথম বৃক্কের সূক্ষ্ম গঠনের সঠিক বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে– প্রত্যেক নেফ্রন ২টি প্রধান অংশে বিভক্ত– রেনাল করপাসল এবং বৃক্কীয় নালিকা বা রেনাল টিউবিউলস।

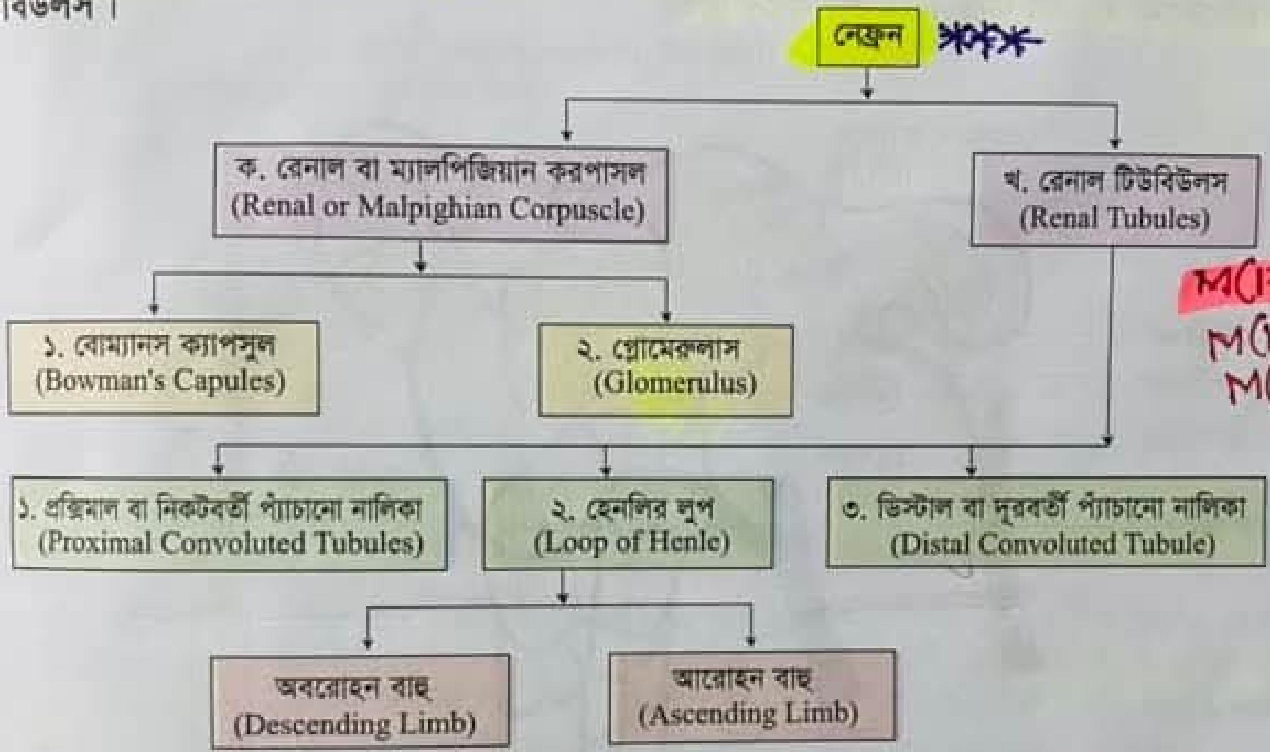

ক রেনাল করপাসল (Renal corpuscle, বা ম্যালপিজিয়ান করপাসল বা ম্যালপিজিয়ান বডি): নেফ্রনের অগ্রপ্রান্তকে রেনাল করপাসল বলে। এটি বৃক্কের কর্টেক্সে অবস্থিত এবং বোম্যানস ক্যাপসুল (Bowman's capsule) ও গ্লোমেরুলাস (glomerulus) নিয়ে গঠিত।

বোম্যানস ক্যাপসুল : রেনাল করপাসলে গ্লোমেরুলার কৈশিকজালিকাগুচ্ছকে ঘিরে অবস্থিত ০.২ মিলিমিটার ব্যাসের ও আঁইশাকার এপিথেলিয়ামে গঠিত দ্বিস্তরী পেয়ালার মতো প্রসারিত অংশকে বোম্যানস ক্যাপসুল বলে। এর গ্লোমেরুলাস সংলগ্ন স্তরকে ভিসেরাল স্তর, বহিঃপ্রাচীরকে প্যারাইটাল স্তর এবং দুই স্তরের মাঝখানে সংকীর্ণ গহ্বরকে ক্যাপসুলার স্পেস (capsular space) বলে। ভিসেরাল স্তরটি পোডোসাইট (podocyte) নামক বিশেষ ধরনের প্রবর্ধনযুক্ত কোষে এবং প্যারাইটাল স্তর স্বাভাবিক আঁইশাকার এপিথেলিয়াল কোষে নির্মিত।

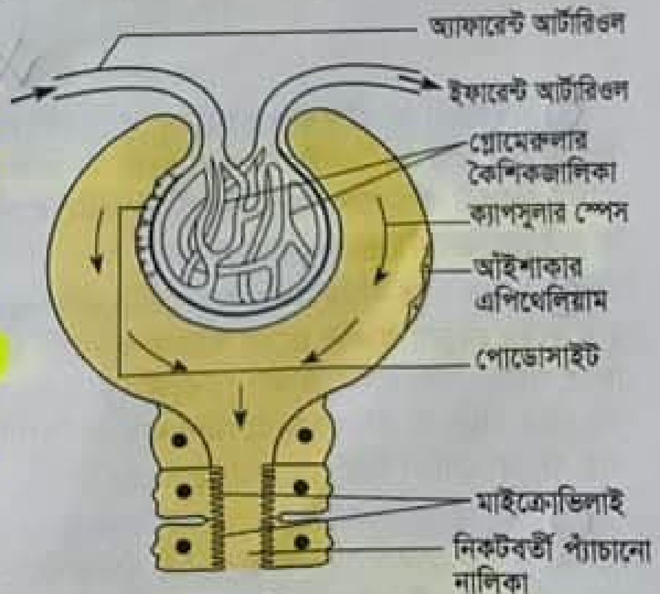

চিত্র ৬.৫ : একটি রেনাল করপাসল

গ্লোমেরুলাস : বোম্যানস ক্যাপসুলের অভ্যন্তরে ঘনিষ্ঠভাবে গ্লোমেরুলাস অবস্থান করে। রেনাল ধমনি থেকে সৃষ্ট একটি ক্ষুদ্র অন্তর্বাহী ধমনিকা বা অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল (afferent

arteriole) বোম্যানস ক্যাপসুলে প্রবেশ করে এবং ৫০-৬০টি কৈশিকজালিকায় বিভক্ত হয়ে গ্লোমেরুলাস গঠন করে। কৈশিকজালিকাগুলো পুনরায় মিলিত হয়ে **বহির্বাহী ধমনিকা** বা **ইফারেন্ট আর্টারিওল** (efferent arteriole) রূপে বোম্যানস ক্যাপসুল থেকে বেরিয়ে আসে। ইফারেন্ট আর্টারিওলের ব্যাস অ্যাফারেন্ট আর্টারিওলের চেয়ে কম হওয়ার কারণে গ্লোমেরুলাসে সর্বদা উচ্চ রক্তচাপ বজায় থাকে।

কাজ: রেনাল করপাসল-এ রক্তের আল্ট্রাফিল্ট্রেশন ঘটে এবং রক্ত থেকে রেচনবর্জ্য, পানি ও অন্যান্য দ্রব্য পরিস্রুত হয়ে **গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট** (glumerular filtrate) হিসেবে বোম্যানস ক্যাপসুলে জমা হয়।

(খ) বৃক্ক নালিকা বা রেনাল টিউবিউলস (Renal tubules) : এটি নেফ্রনের পশ্চাৎঅংশ এবং বোম্যানস ক্যাপসুলের পিছন থেকে সৃষ্টি হয়ে সংগ্রাহী নালি পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রত্যেক রেনাল টিউবিউল প্রায় ৩ সেন্টিমিটার লম্বা এবং গড় ব্যাস প্রায় ৬০ মাইক্রোমিটার। এটি নিচে বর্ণিত ৩টি অংশে বিভক্ত।

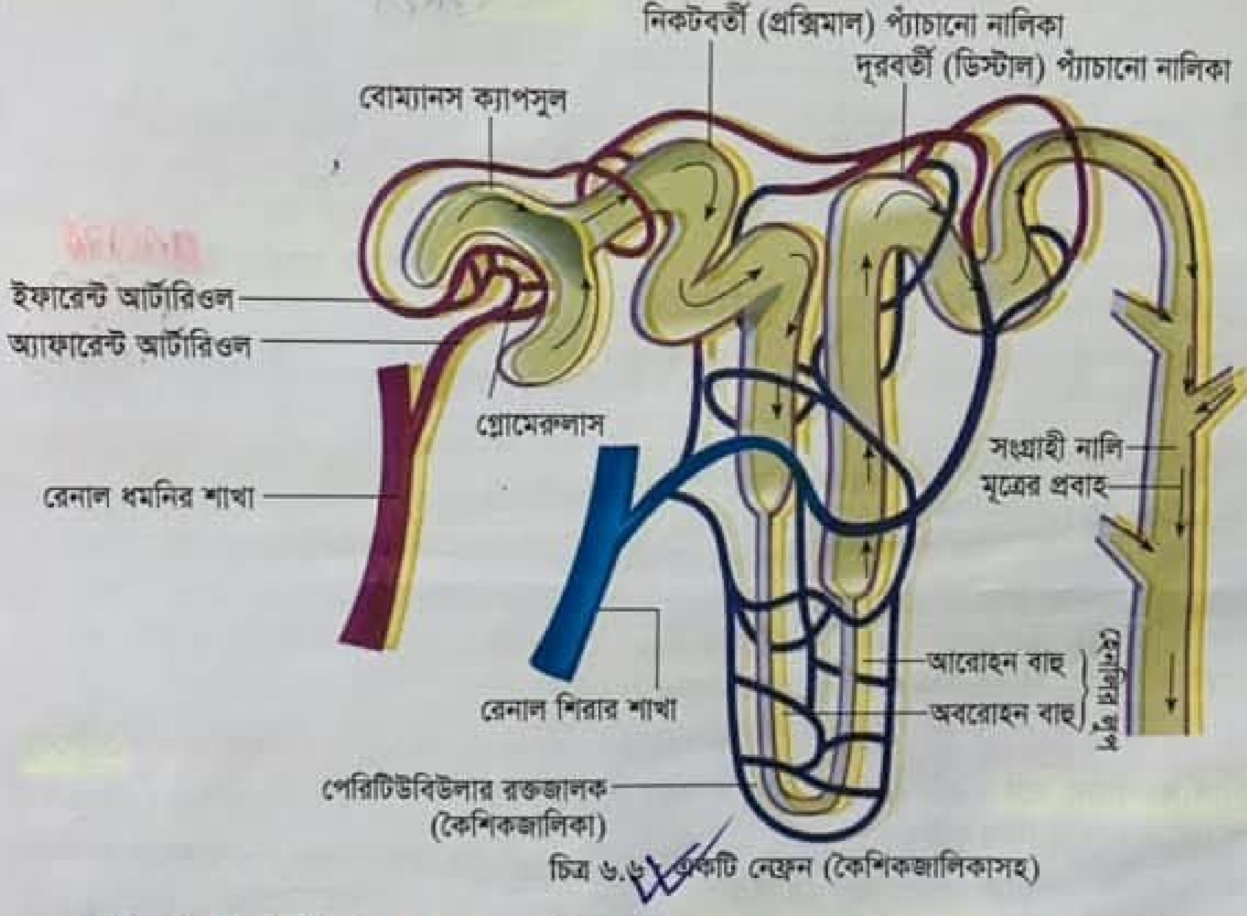

চিত্র ৬.৬ : একটি নেফ্রন (কৈশিকজালিকাসহ)

(i) নিকটবর্তী বা প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকা (Proximal convoluted tubule) : বোম্যানস ক্যাপসুলের সাথে সংযুক্ত এটি প্রায় ১৪ মিলিমিটার লম্বা প্যাঁচানো নালিকা। রেনাল টিউবিউলের এ অংশ বৃক্কের কর্টেক্সে অবস্থিত। এর প্রাচীর এককস্তরী এপিথেলিয়াল কোষে গঠিত। কোষগুলোর একপ্রান্তে অসংখ্য অতিআণুবীক্ষণিক আঙ্গুলের মতো অভিক্ষেপ বা **মাইক্রোভিলাই** (microvilli) থাকে।

(ii) নেফ্রন ফাঁস বা হেনলির লুপ (Loop of Henle): নিকটবর্তী বা প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকার শেষ প্রান্ত সোজা হয়ে বৃক্কের মেডুলা অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং একটি U আকৃতির ফাঁস বা লুপ (loop) গঠন করে পুনরায় কর্টেক্স অঞ্চলে ফিরে আসে। আবিষ্কারক জার্মান চিকিৎসক Friedrich Gustav Jakob Henle-র নামানুসারে একে **হেনলির লুপ** বলা হয়। এর নিম্নগামী নালিকে **অবরোহন বাহু** বা **ডিসেন্ডিং বাহু** (descending limb) এবং উর্ধ্বগামী নালিকে **আরোহন বাহু** বা **অ্যাসেন্ডিং বাহু** (ascending limb) বলে।

(iii) দূরবর্তী বা ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকা (Distal convoluted tubule) : হেনলির লুপ-এর পরবর্তী এ প্যাঁচানো নালিকা প্রায় ৫ মিলিমিটার লম্বা এবং এটি বৃক্কের কর্টেক্সে অবস্থান করে। এর শেষপ্রান্ত সংগ্রাহী নালির সাথে যুক্ত থাকে। এর প্রাচীর এককস্তরী এপিথেলিয়াম কোষে গঠিত।

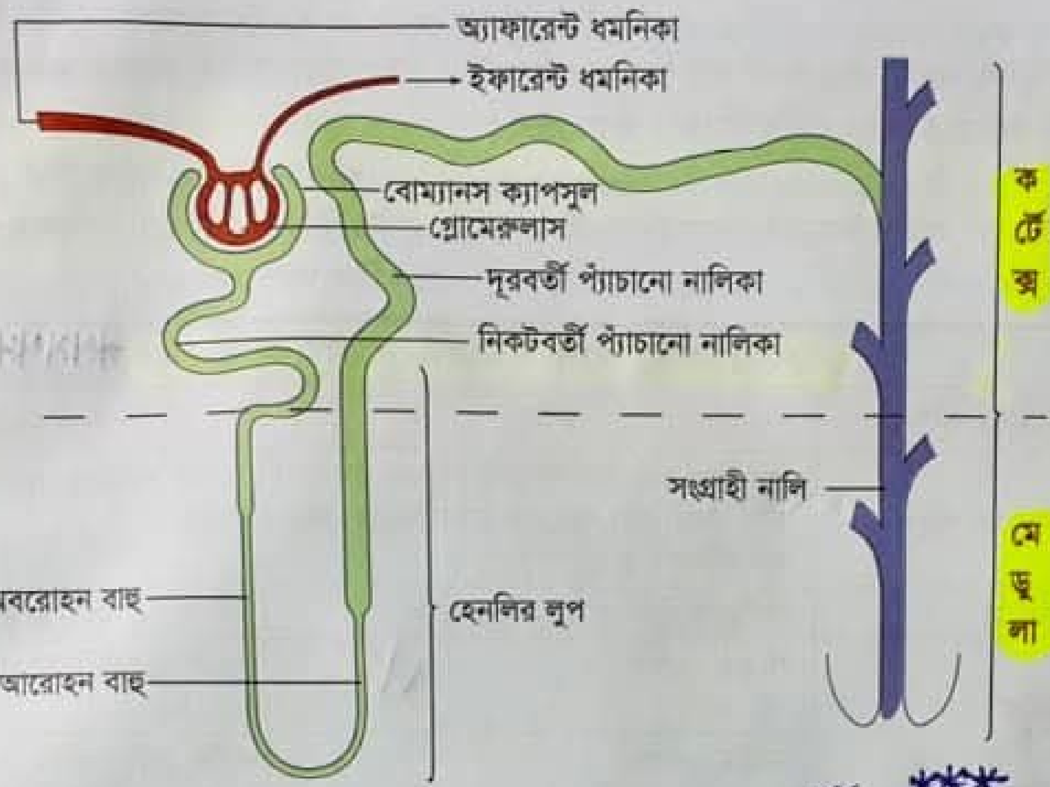

চিত্র ৬.৭ : একটি নেফ্রনের বিভিন্ন অংশ (চিত্রানুগ)

রেনাল টিউবিউলের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী প্যাঁচানো নালিকা সূক্ষ্ম **কৈশিকজালিকা** বা **পেরিটিউবিউলার রক্তজালক** (peritubular capillaries) দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকে। এগুলো নেফ্রনের বিভিন্ন অংশ থেকে বিভিন্ন বস্তু পুনঃশোষণ করে।

নেফ্রনের দূরবর্তী প্যাঁচানো নালিকা যে সোজা নালির সাথে যুক্ত থাকে তাকে **সংগ্রাহী নালি** (collecting duct) বলে। একটি সংগ্রাহী নালিতে কয়েকটি নেফ্রন যুক্ত থাকে। এর কিছু অংশ কর্টেক্সে এবং কিছু অংশ মেডুলায় অবস্থান করে। এর প্রাচীর একস্তরী কোষে গঠিত। কয়েকটি সংগ্রাহী নালি মিলিত হয়ে **ডাক্ট অব বেলিনি** (duct of Bellini) গঠন করে।

কাজ: রেনাল টিউবিউলের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী নালিকা **সূক্ষ্ম কৈশিকজালিকা** বা **পেরিটিউবিউলার ক্যাপিলারি** দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। এগুলো নেফ্রনের বিভিন্ন অংশ হতে বিভিন্ন বস্তু পুনঃশোষণ করে। নেফ্রনের নিকটবর্তী প্যাঁচানো নালিকায় **নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ** (selective reabsorption) ঘটে। এর **হেনলির লুপ** থেকে পানি এবং দূরবর্তী প্যাঁচানো নালিকা থেকে সামান্য পানি ও অন্যান্য বস্তু পুনঃশোষিত হয়।

নেফ্রনের প্রকারভেদ : অবস্থান অনুসারে নেফ্রন তিন প্রকারের হয়। যথা–

সুপারফিসিয়াল কর্টিক্যাল নেফ্রন (Superficial Cortical Nephron) : এসব নেফ্রন বৃক্কের কার্টেক্সের পরিধির দিকে ১ মিলিমিটারের মধ্যে অবস্থিত। ৮৫% নেফ্রন এ প্রকৃতির। এদের হেনলির লুপ খাটো। স্বাভাবিক অবস্থায় এরা মূত্র উৎপাদন করে।

মিড কর্টিক্যাল নেফ্রন (Mid Cortical Nephron) : এ নেফ্রন রেনাল করপাসল ও কর্টেক্সের মাঝামাঝিতে অবস্থান করে। ৫% নেফ্রন এ প্রকৃতির। এদের লুপ খাটো বা লম্বা হয়ে থাকে।

জাক্সটা মেডুলারি নেফ্রন (Juxta Medullary Nephron) : রেনাল করপাসল কর্টেক্সের ভিতরের দিকে কর্টেক্স-মেডুলার সংযোগস্থলের ওপরে অবস্থান করে। এদের হেনলির লুপ অনেক লম্বা। বৃক্কের ১০% নেফ্রন এ প্রকৃতির। জরুরি অবস্থায় এরা মূত্র উৎপন্ন করে থাকে।

নেফ্রনের কাজ

পরিস্রুতকরণ (Filtration) : নেফ্রনের গ্লোমেরুলাস রক্তের প্রোটিন ছাড়া প্রায় সকল উপাদান ছাঁকনির মাধ্যমে পৃথক করে বোম্যান্স ক্যাপসুলের গহ্বরে প্রেরণ করে।

পুনঃশোষণ (Re-absorption) : বৃক্কীয় নালিকার পরিস্রুত তরলের প্রয়োজনীয় পদার্থগুলো যথা– গ্লুকোজ, অধিকাংশ লবণ এবং প্রয়োজনীয় পানি প্রভৃতি পুনরায় শোষিত হয়ে রক্তনালিতে প্রবেশ করে।

নালিকার ক্ষরণ (Tubular Secretion) : বৃক্কীয় নালিকা যে কেবল পুনঃশোষণের কাজ করে তাই নয়, এটি কয়েক প্রকার দূষিত পদার্থ যথা- নানা প্রকারের সালফারঘটিত যৌগ, ক্রিয়েটিনিন এবং কয়েক প্রকারের জৈব এসিড ইত্যাদি রক্তস্রোত থেকে নালিকা গহ্বরে ক্ষরণ করে।

নতুন পদার্থ সৃষ্টি (Manufacture of New Substances) : বৃক্কীয় নালিকার এপিথেলিয় কোষে কয়েক প্রকার যৌগের যথা– অজৈব ফসফেট, অ্যামোনিয়া, হিপপিউরিক এসিড ইত্যাদি সৃষ্টি হয়ে নালিকার গহ্বরে যুক্ত হয়।

p^H মাত্রা নিয়ন্ত্রণ (Balancing of p^H) : দেহস্থিত p^H- এর সঠিক মাত্রা রক্ষা করে।

নেফ্রনের বিভিন্ন অংশ ও সংগ্রাহী নালির কাজের ছক

নেফ্রনের অংশ	কাজ	ক্ষরিত বস্তুর নাম
১. বোম্যানস ক্যাপসুল	এর ভিসেরাল স্তর আল্ট্রাফিল্ট্রেশন অঙ্গরূপে কাজ করে এবং পরিস্রুত তরল সংগ্রহ করে বৃক্ক নালিকাতে প্রেরণ করে।	রক্তের পরিস্রুত তাল (প্রোটিন ছাড়া)।
২. গ্লোমেরুলাস	আল্ট্রাফিল্ট্রেট হিসেবে কাজ করে।	কোলয়েড অংশ ছাড়া রক্তের প্লাজমা।
৩. বৃক্ক নালিকা ক. নিকটবর্তী প্যাঁচানো নালিকা	সক্রিয় শোষণ।	গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, ফসফেট, K^+, Na^+.
	নিষ্ক্রিয় শোষণ	পানি, Cl^-, HCO_3^-, $NaHCO_3$ ও ১০% ইউরিয়া ও ইউরিক এসিড।
	ক্ষরণ	ক্রিয়েটিনিন, হিপপিউরিক এসিড, রঞ্জক, পেনিসিলিনসহ ড্রাগস, H^+ ও NH_3।
খ. হেনলির লুপ	সক্রিয় শোষণ	K^+, Na^+, Cl^-, ইউরিয়া, Ca^{++}, Mg^{++}.
	নিষ্ক্রিয় শোষণ	পানি।
	ক্ষরণ	ইউরিয়া।
গ. দূরবর্তী প্যাঁচানো নালিকা	শোষণ	পানি, Na^+.
	ক্ষরণ	H^+, K^+, NH_4.
সংগ্রাহী নালি	সক্রিয় শোষণ	K^+.
	নিষ্ক্রিয় শোষণ	পানি, Na^+.
	ক্ষরণ	K^+, H^+, HCO_3^-, NH_4.
	পরিস্রুত ও পুনঃশোধিত তরল সংগ্রহ করে ইউরেটারে প্রেরণ করে।	

রেচনের শারীরবৃত্ত (Physiology of Excretion)

আমিষ জাতীয় খাদ্য বিপাকের ফলে দেহে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্যপদার্থ সৃষ্টি হয়। এসব বর্জ্য দেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং যতশীঘ্র সম্ভব দেহ থেকে নিষ্কাশন করা অত্যাবশ্যক। মানুষের প্রধান নাইট্রোজেনঘটিত রেচন বর্জ্য হলো ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, অ্যামোনিয়া, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি। এর মধ্যে ইউরিয়ার পরিমাণ সর্বাধিক এবং এটি মূত্রের সাথে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। যকৃতে ইউরিয়া উৎপন্ন হয় এবং রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে বৃক্কে পৌঁছায়। বৃক্কে মূত্র তৈরি হয়। রেচনে এরূপ ইউরিয়ার আধিক্য থাকাকে **ইউরিওটেলিজম** (ureotelism) বলে। যেসব প্রাণীতে ইউরিওটেলিজম দেখা যায় তাদের **ইউরিওটেলিক প্রাণী** (ureotelic animal) বলা হয়। মানুষ ইউরিওটেলিক হওয়ার কারণে রেচনের শারীরবৃত্তকে তাই দুটি শিরোনামে আলোচনা করা হলো : **ক. নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য উৎপাদন** এবং **খ. মূত্র সৃষ্টি**

ক) নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য উৎপাদন (Production of Nitrogenous Wastes)

আমিষ খাদ্য পরিপাক হয়ে অ্যামিনো এসিডে পরিণত হয়। অ্যামিনো এসিড প্রধানত দেহ গঠন ও বৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হয়। যকৃতে অব্যবহৃত ও অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড থেকে **ডিঅ্যামাইনেজ** এনজাইমের উপস্থিতিতে **ডিঅ্যামিনেশন** (deamination) প্রক্রিয়ায় অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$) হয়ে কিটো এসিড ও NH_2 সৃষ্টি করে। কিটো এসিড শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। অ্যামিনো গ্রুপ পরিবর্তিত হয়ে NH_3 (অ্যামোনিয়া) উৎপন্ন করে।

১. আমিষ খাদ্য $\xrightarrow{\text{এনজাইম}}$ অ্যামিনো এসিড

২. অ্যামিনো এসিড $\xrightarrow{\text{ডিঅ্যামিনেশন}}$ কিটো এসিড + $-NH_2$

৩. $-NH_2 + H^+ \longrightarrow NH_3$ (অ্যামোনিয়া)

৪. $2NH_3 + CO_2 \xrightarrow{\text{অরনিথিন চক্র}} CO(NH_2)_2$ (ইউরিয়া) $+ H_2O$

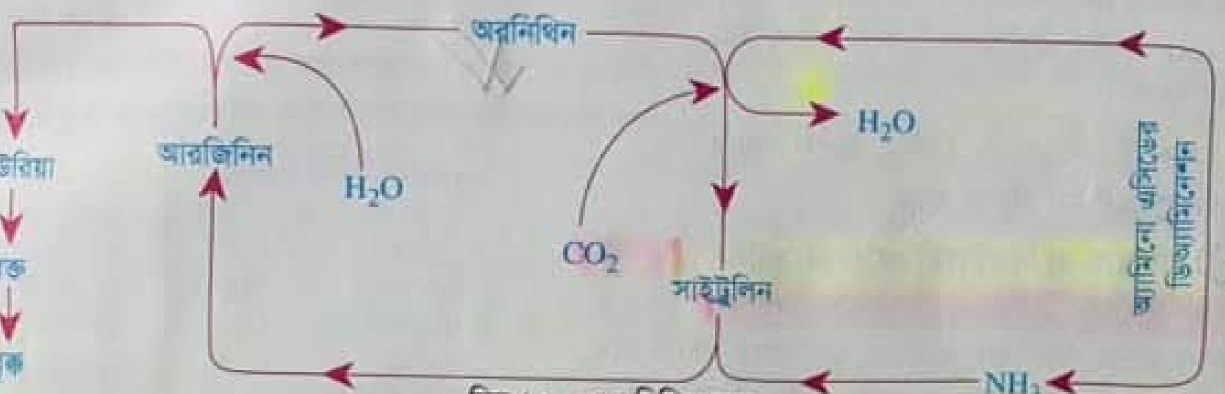

চিত্র ৬.৮ : অরনিথিন চক্র

NH_3 অত্যন্ত বিষাক্ত যা CO_2 এর সাথে মিলিত হয়ে যকৃতে **অরনিথিন চক্র** (ornithine cycle)-এর মাধ্যমে কম ক্ষতিকর ও পানিতে দ্রবণীয় **ইউরিয়া** (urea)-য় পরিণত হয়। এটি **ইউরিয়া চক্র** নামেও পরিচিত। ইউরিয়া প্লাজমায় (রক্তরসে) অবস্থান করে এবং সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে বৃক্কে পৌছায়।

খ) মূত্র সৃষ্টি (Formation of Urine)

স্কটিশ শারীরবিজ্ঞানী Arthur Robertson Cushney (1917)-র মতে, নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্যপদার্থ রক্তের মাধ্যমে বৃক্কে আসার পর তিনটি ধাপে মূত্র সৃষ্টি হয়, যথা: ১ অতিসূক্ষ্ম পরিস্রাবণ, ২ টিউবিউলার পুনঃশোষণ এবং ৩ সক্রিয় ক্ষরণ। নিচে ধাপগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. অতিসূক্ষ্ম পরিস্রাবণ বা আল্ট্রাফিল্ট্রেশন (Ultrafiltration): মূত্র তৈরির প্রথম ধাপ হচ্ছে রক্তের অতিসূক্ষ্ম পরিস্রাবণ। নেফ্রনের রেনাল করপাসলে এ পদ্ধতি সংঘটিত হয়। এ প্রক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ড থেকে পৃষ্ঠীয় ধমনি, রেনাল ধমনি এবং অ্যাফারেন্ট আর্টারিওলের মাধ্যমে রক্ত অতি উচ্চচাপে গ্লোমেরুলাসে প্রবেশ করে। সাধারণত অ্যাফারেন্ট আর্টারিওলের তুলনায় ইফারেন্ট আর্টারিওলের ব্যাস সংকীর্ণ হওয়ায় গ্লোমেরুলাসে রক্তের উচ্চচাপ সৃষ্টি হয়। এ হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপে রক্তের প্রোটিন ও রক্তকণিকা ছাড়া সমস্ত পানি, লবণ, শর্করা, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড প্রভৃতি কৈশিকজালিকার এন্ডোথেলিয়াম ও ভিত্তিঝিল্লি এবং রেনাল ক্যাপসুলের এপিথেলিয়াম ভেদ করে **ক্যাপসুলার স্পেস**-এ জমা হয়। এ পরিস্রুত তরলকে **গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট** (glomerular filtrate) বা **প্রাথমিক মূত্র** বলে। মানবদেহের দুটি বৃক্কের মাধ্যমে প্রতি মিনিটে প্রায় 1200 ml রক্ত প্রবাহিত হয়। এ রক্ত থেকে প্রায় 125 ml গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট (পরিস্রুত) উৎপন্ন হয়ে বোম্যানস ক্যাপসুল-এ জমা হয়। অন্যদিকে পরিস্রুত রক্ত পরে ইফারেন্ট আর্টারিওলে প্রবেশ করে। যে চাপের মাধ্যমে রক্তের দ্রাব্যবস্তু পরিস্রুত হয়, তাকে বলে **কার্যকর পরিস্রাবণ চাপ** (effective filtration pressure)। পরিস্রাবণ প্রক্রিয়াটি চাপ প্রয়োগের ফলে সংঘটিত হয় বলে একে **আল্ট্রাফিল্ট্রেশন** বলা হয়। হিসেবে দেখা গেছে, কার্যকর পরিস্রাবণ চাপ ২৫ mmHg। এ চাপের প্রভাবে প্রতি মিনিটে প্রায় ১২৫ ml রক্তরস গ্লোমেরুলাস থেকে পরিস্রুত হয়। তবে এ হার পরিস্রাবণ চাপের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত।

② টিউবিউলার পুনঃশোষণ (Tubular Reabsorption) বা নির্বাচিত পুনঃশোষণ (Selective Reabsorption): বোম্যানস ক্যাপসুল থেকে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট বৃক্ক নালিকা বা রেনাল টিউবিউলে প্রবেশ করে। এখানে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেটের ৮০% নির্বাচিত পদার্থ পুনঃশোষিত হয়ে রক্তে প্রবেশ করে। টিউবিউলের প্রাচীরের কোষগুলো পুনঃশোষণের জন্য বিশেষভাবে অভিযোজিত। যেমন- (i) কোষগুলোর একপাশে মাইক্রোভিলাই ও বেসাল চ্যানেল থাকায় এদের শোষণতল বেশি; (ii) সাইটোপ্লাজমে বেশি সংখ্যক মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে এবং (iii) রক্তের কৈশিকজালিকার সাথে ঘন সন্নিবিষ্ট থাকে।

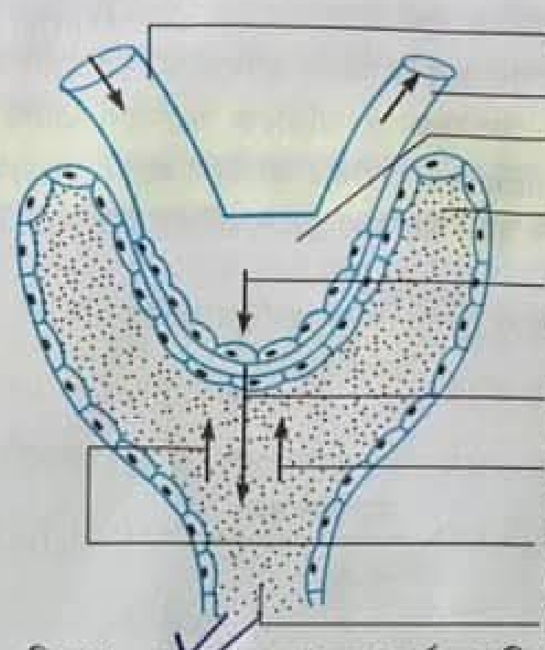

চিত্র ৬.৯ : বোম্যানস ক্যাপসুলে কার্যকর পরিস্রাবণ চাপ নির্ধারণের চিত্ররূপ [কার্যকর পরিস্রাবণ চাপ = ৭৫−(৩০+২০) = ২৫mmHg]

রেনাল টিউবিউলসের বিভিন্ন অংশে যেসব পদার্থের পুনঃশোষণ হয় তা হলো –

(i) প্রক্সিমাল বা নিকটবর্তী প্যাঁচানো নালিকা : এখানে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেটের ৬০% পুনঃশোষিত হয়। গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, ভিটামিন, হরমোন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্লোরাইড, ফসফেট, বাইকার্বোনেট, পানি, কিছু ইউরিয়া ইত্যাদি এ অংশে পুনঃশোষিত হয়।

(ii) হেনলির লুপ : এখানে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্লোরাইড ও অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি পুনঃশোষিত হয়।

(iii) ডিস্টাল বা দূরবর্তী প্যাঁচানো নালিকা: এখানে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, হাইড্রোজেন, ক্লোরিন আয়ন ইত্যাদি পুনঃশোষিত হয়। অন্যদিকে ADH (অ্যান্টি ডাইইউরেটিক হরমোন) পানি পুনঃশোষণে সাহায্য করে।

(iv) সংগ্রাহী নালি : এখানে প্রধানত পানি এবং অল্প পরিমাণ Cl^-, Na^+ ও ইউরিয়া পুনঃশোষিত হয়।

③ টিউবিউলার ক্ষরণ বা সক্রিয় ক্ষরণ (Active Secretion) : বিপাক ক্রিয়ায় সৃষ্ট কিছু অপ্রয়োজনীয় উপজাত পদার্থ, যথা–ক্রিয়েটিনিন ও কিছু ইউরিয়া নিকটবর্তী প্যাঁচানো নালিকার চারপাশে রক্তজালক থেকে সক্রিয় ক্ষরণের মাধ্যমে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেটের সাথে যুক্ত হয়। দূরবর্তী প্যাচানো নালিকায় হাইড্রোজেন আয়ন, পটাসিয়াম ও অ্যামোনিয়াম আয়ন, সেরোটোনিন, কোলিন,

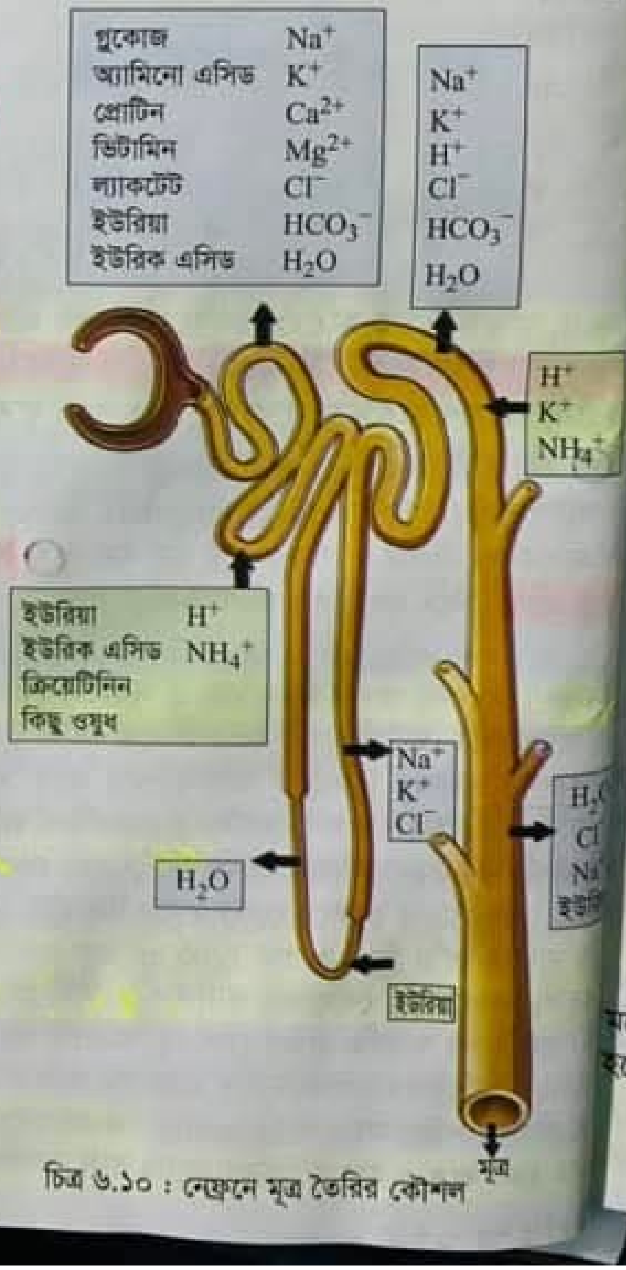

চিত্র ৬.১০ : নেফ্রনে মূত্র তৈরির কৌশল

হিস্টামিন ইত্যাদি ক্ষরিত হয়ে ফিল্ট্রেটের সাথে মিশে মূত্রে (urine) পরিণত হয়। উৎপন্ন মূত্র অতঃপর সংগ্রাহী নালিকা, ইউরেটার হয়ে মূত্রথলি এবং মূত্রথলি থেকে মূত্রনালির মাধ্যমে বাইরে নিষ্কাশিত হয়।

মূত্র বা নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্যপদার্থ নিষ্কাশনের গতিপথ নিচে দেখানো হলো :

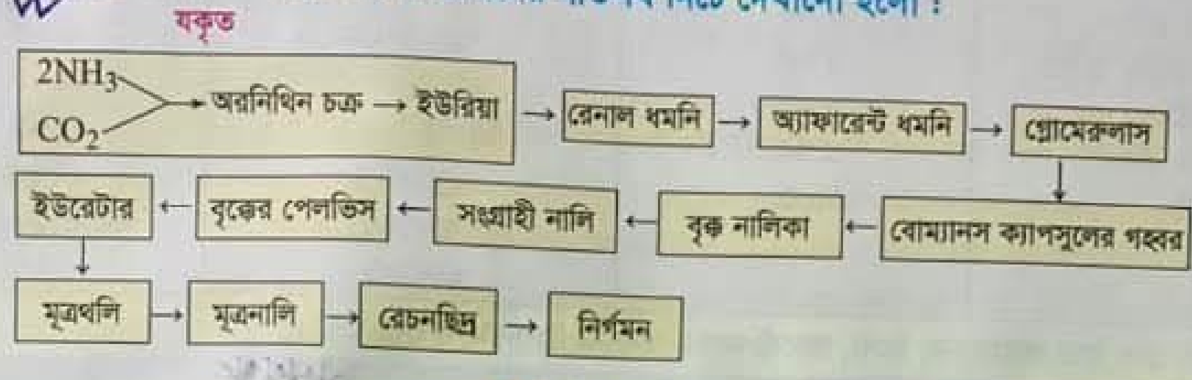

মূত্র (Urine)

নেফ্রনের রেনাল টিউবিউলসে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেটের নির্বাচিত পুনঃশোষণের পর যে খড় বর্ণের, তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত ও অম্লধর্মী তরল রেচন বর্জ্য মূত্রথলিতে জমা হয় তাকে মূত্র বলে। একজন সুস্থ মানুষ দৈনিক গড়ে ১.৫ লিটার মূত্র ত্যাগ করে। তবে কিছু কারণে এ পরিমাণ প্রভাবিত হয়ে থাকে। যেমন–খাদ্যে তরল পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকলে মূত্রের মাত্রা বৃদ্ধি পায় ও শরীরে ঘাম বেশি হলে মূত্রের পরিমাণ কমে যায়। খাদ্যের প্রকৃতিও অনেক সময় মূত্রের পরিমাণের পার্থক্য ঘটায়। লবণাক্ত খাদ্য সাধারণত মূত্রের পরিমাণ বাড়ায়। বহুমূত্র (diabetes), বৃক্ক প্রদাহ (nephritis) প্রভৃতি রোগ প্রস্রাবের হার ও মাত্রা উভয়কে প্রভাবিত করে। কিছু দ্রব্য মূত্রের স্বাভাবিক প্রবাহকে বাড়িয়ে দেয়। এসব দ্রব্য **ডাইইউরেটিকস** (diuretics) বা **মূত্রবর্ধক** নামে পরিচিত। পানি, লবণাক্ত পানি, চা ও কফি এ ধরনের দ্রব্য। দেহে দৈনিক স্বাভাবিকের চেয়ে অতিরিক্ত মূত্র (>২.৫ লিটার) উৎপাদিত হলে তাকে **পলিউরিয়া** (polyuria), মূত্রের পরিমাণ <৪০০ মি.লি. হলে **অলিগোরিয়া** (oliguria) এবং <১০০ মি.লি হলে **অ্যানুরিয়া** (anuria) বলে।

মূত্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Urine)

মূত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো হলো–

১. **বর্ণ (Colour) :** স্বাভাবিক মূত্র হালকা হলুদ বা খড় বর্ণের (straw colour)। মূত্রে **ইউরোক্রোম** (urochrome) নামক রঞ্জক পদার্থ থাকায় মূত্রের রং হালকা হলুদ হয়।

২. **পরিমাণ (Volume) :** প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের মূত্রের পরিমাণ ৬০০– ২৫০০ মিলিলিটার। পানি পানের মাত্রা, খাদ্যের ধরন, পরিবেশের তাপমাত্রা, মানসিক ও দৈহিক অবস্থায় ইত্যাদির ওপর মূত্রের উৎপাদন নির্ভর করে।

৩. **আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity) :** মূত্রের স্বাভাবিক আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.০০৮ – ১.০৩০।

৪. **বিক্রিয়া (Reaction) :** তাজা মূত্র স্বচ্ছ ও হালকা অম্লধর্মী। মূত্রের গড় p^H মান হচ্ছে 6.0 (মাত্রা 4.5 - 8.0)।

৫. **গন্ধ (Odour) :** মূত্রের গন্ধ অনেকটা অ্যারোমেটিক (aromatic)। মূত্রে উদবায়ু জৈবপদার্থ থাকার জন্য এমন গন্ধ হয়। এছাড়া দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ **ইউরিনোড** (C_6H_8O) এর উপস্থিতির জন্য মূত্রে গন্ধ হয়। স্বাভাবিক মূত্রকে ফেলে রাখলে অ্যামোনিয়ার গন্ধ হয়। মূত্রের ইউরিয়া জীবাণুর সংস্পর্শে এসে অ্যামোনিয়ায় রূপান্তরিত হয়।

মূত্রের রাসায়নিক উপাদান (Chemical Composition of Urine)

মূত্রের রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে ৯৫% (৯৫-৯৭%) পানি এবং ৫% (৩–৫%) কঠিন পদার্থ। কঠিন পদার্থের মধ্যে জৈব ও অজৈব উপাদান রয়েছে। নিচে ছক আকারে জৈব (৬০%) ও অজৈব (৪০%) উপাদানগুলো দেখানো হলো।

D(07), M(12), D(10)

জৈব উপাদান	শতকরা হার	অজৈব উপাদান	শতকরা হার
ইউরিয়া	২	সোডিয়াম	০.৩৫
ইউরিক এসিড	০.০৫	পটাসিয়াম	০.১৫
হিপপিউরিক এসিড	০.০৫	ক্যালসিয়াম	০.০৩
ক্রিয়েটিনিন	০.০৭	অ্যামোনিয়াম	০.০৪
কিটোন বডিস	০.০২	ম্যাগনেসিয়াম	০.০১
ক্রিয়েটিন	০.০১	ক্লোরাইড	০.৬০
		সালফেট	০.১৮
		ফসফেট	০.২৭

এছাড়াও মূত্রে আয়োডিন, সিসা, আর্সেনিকসহ অন্যান্য উপাদান পাওয়া যায়।

মূত্রের অস্বাভাবিক কিছু উপাদান

অস্বাভাবিক উপাদান	যে রোগে নির্গত হয়	উপাদানটির উপস্থিতিকে যা বলা হয়
১. গ্লুকোজ	ডায়াবেটিস মিলিটাস	গ্লুকোসুরিয়া (Glucosuria)
২. প্রোটিন	বৃক্কের প্রদাহ, লিউকেমিয়া, লিম্ফোসারকোমা প্রভৃতি	প্রোটিনিউরিয়া (Proteinuria)
৩. লিপিড	বৃক্কে রোগ, অ্যালকোহলের ক্রিয়া	লিপুরিয়া (Lipuria)
৪. বিলিরুবিন	জন্ডিস	বিলিরুবিনিউরিয়া (Bilirubinuria)
৫. রক্ত	বৃক্কে প্রদাহ, প্রস্টেট প্রদাহ, বৃক্কে আঘাত	হিমাচুরিয়া (Himaturia)

মূত্রত্যাগ (Micturition or Urination) : মূত্রথলি থেকে মূত্রনালির মাধ্যমে দেহ থেকে মূত্র নিষ্কাশিত হওয়ার কৌশলকে মূত্রত্যাগ বলে। মানুষের মূত্রথলিতে ২৮০–৩২০ মিলিলিটার মূত্র জমা হলেই একটি চাপ সৃষ্টি হয়। চা, কফি, অ্যালকোহল ইত্যাদি পানীয় মূত্র সৃষ্টি ত্বরান্বিত করে। এজন্য এদের **ডাইইউরেট** বলা হয়। মূত্রনালির **ডেট্রুসর পেশির** (detrusor muscle) সংকোচন ও **স্ফিঙ্কটার পেশির** (sphincter muscle) প্রসারণ ঘটিয়ে মূত্র দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয়। একজন সুস্থ মানুষ দৈনিক ৬-৮ বার মূত্র ত্যাগ করে।

রেচন ও অসমোরেগুলেশনে বৃক্কের ভূমিকা

কোষ থেকে নাইট্রোজেনঘটিত বিপাকীয় বর্জ্যের অপসারণের আরেক নাম **রেচন**। বিপাকীয় বর্জ্য দেহের জন্য অপ্রয়োজনীয়। দেহকোষ, টিস্যু ও অঙ্গে যে অসংখ্য রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তার ফলে দেহের জন্য ক্ষতিকর যেসব বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় তা রেচনে এবং দেহের অসমোরেগুলেশনে (রক্তে পানি ও আয়নসাম্য রক্ষা) বৃক্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে রেচন ও অসমোরেগুলেশনে বৃক্কের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো।

রেচনে বৃক্কের ভূমিকা (Role of Kidney in Excretion)

বৃক্ক প্রধানত নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ দেহ থেকে নিষ্কাশন করে। আমিষ জাতীয় খাদ্য বিপাকের ফলে দেহে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য সৃষ্টি হয়। অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি মানুষের প্রধান নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য। এদের **রেচন বর্জ্য** বলে। এগুলো রক্তের মাধ্যমে সারাদেহে প্রবাহিত হয়। এগুলো বিষাক্ত ও দেহের জন্য ক্ষতিকর। তাই এসব রেচন পদার্থ দেহ থেকে নিষ্কাশন করা অত্যাবশ্যক। বৃক্ক এসব রেচন পদার্থ দেহ থেকে অপসারণ করে দেহকে সুস্থ রাখে। নিম্নলিখিত উপায়ে বৃক্ক এসব বর্জ্য নিষ্কাশন করে।

১. ইউরিয়া বর্জ্য : আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয়ে অ্যামিনো এসিডে পরিণত হয়। অ্যামিনো এসিড প্রধানত দেহ গঠন ও বৃদ্ধির কাজ করে থাকে। অ্যামিনো এসিডের বৈশিষ্ট্য হলো দেহে যতটুকু অ্যামিনো এসিড প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই ব্যবহৃত হতে পারে, অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড দেহে সঞ্চিত থাকতে পারে না।

অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড যকৃতে **ডি-অ্যামাইনেজ** এনজাইমের উপস্থিতিতে **ডি-অ্যামিনেশন** (deaminatio

প্রক্রিয়ায় কিটো এসিড ও অ্যামিন মূলক ($-NH_2$) সৃষ্টি করে। কিটো এসিড শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং অ্যামিন মূলক ($-NH_2$) হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) এর সাথে যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়া (NH_3) সৃষ্টি করে। অ্যামোনিয়া (NH_3) অত্যন্ত বিষাক্ত। এটি CO_2 এর সাথে যুক্ত হয়ে যকৃতে **অরনিথিন চক্রের** মাধ্যমে কম ক্ষতিকারক ও পানিতে দ্রবণীয় ইউরিয়াতে পরিণত হয়। ইউরিয়া রক্তের প্লাজমায় (রক্তরসে) অবস্থান করে এবং সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে বৃক্কে পৌঁছে। এরপর মূত্র সৃষ্টির মাধ্যমে দেহ থেকে বহিষ্কৃত হয়।

২) **ইউরিক এসিড বর্জ্য :** যকৃতের কোষে নিউক্লিক এসিডের **পিউরিন** ক্ষারক বিপাকের ফলে ইউরিক এসিড সৃষ্টি হয়। এটি ইউরিয়া অপেক্ষা কম বিষাক্ত। ইউরিক এসিড রক্তের মাধ্যমে বৃক্কে পৌঁছে এবং দেহ থেকে বহিষ্কৃত হয়।

৩) **ক্রিয়েটিনিন বর্জ্য :** দেহের পেশিতে অবস্থিত **ক্রিয়েটিন** (creatine) নামক অ্যামিনো এসিডের বিপাকের ফলে ক্রিয়েটিনিন বর্জ্য সৃষ্টি হয়। দেহে বিদ্যমান প্রায় ২% ক্রিয়েটিন বিপাক প্রক্রিয়ায় পেশিতে শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং ক্রিয়েটিনিন সৃষ্টি করে। ক্রিয়েটিনিন রক্তের মাধ্যমে বৃক্কে পৌঁছে। বৃক্কে রক্ত থেকে ক্রিয়েটিনিন পরিস্রুত হয়ে মূত্রের সাথে দেহ থেকে বের হয়ে যায়। রক্তে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা দ্বারা বৃক্কের সুস্থ্যতা নির্ণয় করা হয়। তাই রক্তের ক্রিয়েটিনিন মাত্রাকে **বৃক্কের রোগ নির্ণয়ের নির্দেশক** (diagnostic index of kidney) হিসেবে গণ্য করা হয়। রক্তে ক্রিয়েটিনিন স্বাভাবিক মাত্রা পুরুষের 0.6 - 1.2 mg/dl এবং মহিলাদের 0.5 - 1.1 mg/dl. বৃক্কের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষ, অতিরিক্ত ওষুধ, হরমোন ইত্যাদিও মূত্রের সাথে বহিষ্কৃত হয়।

অসমোরেগুলেশনে বৃক্কের ভূমিকা (Role of Kidney in Osmoregulation) CQ

অসমোরেগুলেশন প্রক্রিয়া বলতে জীবন্ত কোষ বা দেহের অন্তঃ ও বহিঃপরিবেশের মধ্যে অভিস্রবণিক চাপের সমতা রক্ষাকে বুঝায়। বৃক্ক দেহের **অভ্যন্তরীণ পরিবেশের স্থিতি বজায় রাখতে** (homeostasis) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেহের পানি ও সোডিয়াম, পটাসিয়াম লবণ এবং ক্লোরাইড আয়নের মধ্যে একটি আন্তরসাম্য রক্ষা প্রক্রিয়াকে **অসমোরেগুলেশন** বলা হয়। দেহে অন্তঃঅভিস্রবণিক চাপের সমতা বিধান দেহের জন্য অপরিহার্য। এতে করে দেহ তরল (body fluid) খুব ঘনও হয়না আবার খুব হালকাও হয়না। দেহের মধ্যস্থ তরল পদার্থ ও দ্রবীভূত লবণসমূহের ঘনত্বের উপর অভিস্রবণ প্রক্রিয়া নির্ভর করে। কোষের অভ্যন্তরের তরল পদার্থ এবং কোষের বাইরে, যেমন-রক্তের প্লাজমা অংশ, টিস্যুরস ও লিম্ফ ইত্যাদি তরল পদার্থের গঠন একটি সুনির্দিষ্ট মাত্রায় বজায় রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

দেহে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পানি ও লবণের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। যেমন, শ্বসনের মাধ্যমে কিছু পানি হারিয়ে যায়। ঘাম নিঃসরণের মধ্য দিয়ে শরীর থেকে কিছু পরিমাণ পানি নিষ্কাশিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেহ তরলের অভিস্রবণিক চাপের তেমন তারতম্য ঘটে না। কারণ বৃক্ক এই অভিস্রবণিক চাপকে তেমন বাড়তে বা কমতে দেয় না। মূত্রের সঠিক পরিমাণকে বজায় রেখে বৃক্ক দেহ তরলের পরিমাণ ও অভিস্রবণিক চাপকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন– খুব বেশি-পরিমাণ পানি এক সঙ্গে পান করা হলে ৩-৪ ঘণ্টার মধ্যে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিমাণ মূত্র ত্যাগ হয়। এরপর মূত্রের পরিমাণ স্বাভাবিক হয়ে আসবে। বৃক্ক জানে কি পরিমাণ অতিরিক্ত পানি গ্রহণ করা হয়েছিল, আর প্রায় সেই পরিমাণ পানি শরীর থেকে নিষ্কাশিত করতে হবে।

অসমোরেগুলেশন পদ্ধতি : দেহে পানির সমতা রক্ষা করার জন্যে **অ্যান্টিডাইইউরেটিক হরমোন** (Antidiuretic Hormone, ADH) নামক একটি হরমোন রয়েছে। ADH-কে **ভ্যাসোপ্রেসিন** (vasopressin)-ও বলা হয়। দেহের পানির পরিমাণ কম হলে রক্তে ADH এর পরিমাণ বেড়ে যায়, ফলে বৃক্ক অল্প পরিমাণ (মিনিটে ০.৫ মিলিলিটার) মূত্র উৎপন্ন করে এবং দেহের পানির পরিমাণ ঠিক রাখে। অন্যদিকে কোন কারণে পানির আধিক্য দেখা দিলে রক্তে ADH অতিমাত্রায় কমে যায় এবং দেহের পানির পরিমাণ বেড়ে যায় কারণ বৃক্কে পানি শোষণের ক্ষমতা কমে যায়। এ অবস্থায় মূত্রের পরিমাণ প্রতি মিনিটে ১৬ মিলিলিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। মস্তিষ্কের গোড়ায় **হাইপোথ্যালামাস** অংশে কিছু স্নায়ুকোষ এ ADH ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এখান থেকে **নিউরোসিক্রেশন** (neurosecretion) পদ্ধতির মাধ্যমে নিঃসৃত ADH পশ্চাৎপিটুইটারি গ্রন্থির মধ্যে পরিবাহিত হয় এবং রক্তে অবমুক্ত হয়। হাইপোথ্যালামাসের মধ্যে উপস্থিত-**অসমোরিসেপ্টর** (osmoreceptor) নামক স্নায়ুকোষ দেহ তরলের অভিস্রবণিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

সোডিয়াম আয়ন সমতা রক্ষা

Na^+ দেহতরলে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং এটি দেহের বহিঃকোষীয় তরলের আয়তন ঠিক রাখে। বহিঃকোষীয় তরলে Na^+ আয়নের ঘনত্ব থাকে প্রায় 142 mmol/L এবং অন্তঃকোষীয় তরলে 10mmol/L। সুস্থ স্বাভাবিক দেহে এ ঘনমাত্রা সর্বদা ধ্রুব থাকে। সাধারণ খাদ্য, খাবার লবণ এবং পানীয় এর সাথে দেহে চাহিদার বেশি Na^+ প্রবেশ করে থাকে। মূত্র, ঘাম এবং মলের সাথে অতিরিক্ত Na^+ দেহ হতে বের হয়ে যায়।

পটাসিয়াম আয়ন সমতা রক্ষা

K^+ এর অভাবে পেশির দুর্বলতা ও ডায়রিয়া দেখা দেয়। এর কম বা বেশি উপস্থিতি হৃদরোগ সৃষ্টি করে থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় এর ঘনত্ব বহিঃকোষীয় তরলে 4mmol/L এবং অন্তঃকোষীয় তরলে 160mmol/L. প্রয়োজনের অতিরিক্ত K^+ মূত্র ও মলের সাথে দেহ হতে নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

বৃক্ক ভালো রাখতে কী করা উচিত ?

(i) বৃক্ক ভালো রাখতে সবাইকে পর্যাপ্ত পানি খেতে হবে। এই পানি অবশ্যই হতে হবে নিরাপদ। অসুস্থতায় (জ্বর, ডায়রিয়া, বমি প্রভৃতি) এবং ব্যায়ামের পর পানির চাহিদা বাড়ে। বিশেষত ডায়রিয়া বা বমি হলে পর্যাপ্ত পানি, স্যালাইন এবং তরল খাবার খেতে হবে অবশ্যই। গর্ভবর্তী এবং স্তন্যদায়ী মায়ের জন্য পানির চাহিদা বেশি। আবহাওয়ার পরিবর্তনে পানির চাহিদা কমবেশি হয়। (ii) ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। (iii) সুষম খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। (iv) রোজ অন্তত ৩০ মিনিট ব্যায়াম করতে হবে (রোজ না পারলেও সপ্তাহের অধিকাংশ দিন)। হাঁটা, দৌড়ানো, সাইকেল চালানো, ফ্রি-হ্যান্ড ব্যায়াম ভালো। (v) ধূমপান, পান-জর্দা, অ্যালকোহল বর্জনীয়। ধূমপায়ীর কিডনিতে রক্তসঞ্চালন কমে যায়। কিডনির কর্মক্ষমতা কমে যায়। ক্যানসারের ঝুঁকিও বাড়ে। (vi) পর্যাপ্ত ঘুম চাই রোজ। মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। (vii) চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ সেবন না করাই ভালো। বিশেষত ব্যথানাশক সেবন করা একেবারেই উচিত নয়।

বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল, লক্ষণ ও করণীয় (Acute Renal Failure, Symptoms and Measures)

বয়স বাড়ার সাথে সাথে বৃক্কের কাজকর্মেও (বিশেষ করে পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায়) পরিবর্তন ঘটে, সক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে আসে। বলা হয়ে থাকে, ৭০ বছর বয়স্ক মানুষের বৃক্ক মাত্র ৫০% কাজে সক্ষম থাকে। রোগ-ব্যাধির কারণে বৃক্কের সক্ষমতা কমে যাওয়াকে **বৃক্ক বিকল** (kidney failure) বলে। বৃক্কের বৈকল্য দুভাবে দেখা দিতে পারে, একটি হচ্ছে **দীর্ঘস্থায়ী** (chronic), অন্যটি **তাৎক্ষণিক** (acute)।

১. বৃক্কের দীর্ঘস্থায়ী বিকল বা ক্রনিক রেনাল ফেইলুর (Chronic Renal Failure) : বৃক্ক যখন নিজস্ব কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে এর কার্যকারিতা ৩ মাস বা এর অধিক সময় পর্যন্ত লোপ পেয়ে থাকে তখন তাকে **বৃক্কের দীর্ঘস্থায়ী বিকল** বলে। এ ধরনের রোগীদের সাধারণত তেমন কোন উপসর্গ পরিলক্ষিত হয় না। ফলে বছরের পর বছর এরা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় না। যখন উপসর্গ দেখা দেয় তখন তাদের বৃক্কের কার্যকারিতা ৭০-৭৫% লোপ পায়। এসব রোগীদের ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা করে পরিপূর্ণ সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। কেবল **ডায়ালাইসিস অথবা বৃক্ক প্রতিস্থাপনই** এসব রোগীদের একমাত্র চিকিৎসা।

২. বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল বা অ্যাকিউট রেনাল ফেইলুর (Acute Renal Failure) : মাত্র ৪৮ ঘন্টার মধ্যে যখন বৃক্ক দেহের বর্জ্যপদার্থ অপসারণ, পানিসাম্য ও ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে অক্ষম হয়ে পড়ে তখন এ অবস্থাকে **বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল** বলে। এ ধরনের বিকলের ফলে প্রস্রাবের মাত্রা কমে যায় বা প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এ রোগ হলে রক্তে ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিনের পরিমাণ বেড়ে যায়। ডায়ালাইসিস অথবা অন্যান্য চিকিৎসার মাধ্যমে এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। দ্রুততম সময়ের মধ্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে রোগীর মৃত্যু হতে পারে। কারণ এর ফলে দেহে যে পটাসিয়াম আয়ন উৎপন্ন হয় তা অপসারিত হয় না ফলে রক্তে K^+ এর পরিমাণ বেড়ে যায় যা হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ করে দিতে পারে।

যেহেতু মানবদেহে **দুটি বৃক্ক** থাকে তাই একটি বৃক্ক ক্ষতিগ্রস্ত হলে অন্যটি যদি সুস্থ থাকে তাহলে সুস্থ বৃক্কই দুটি বৃক্কের কাজ সম্পন্ন করে।

এ উপঅধ্যায়ে সিলেবাসভুক্ত বৃক্কের শুধু তাৎক্ষণিক বিকল, লক্ষণ ও করণীয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকলের কারণ

সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রায় ৭০% বৃক্ক বিকলের জন্য দায়ী ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ। তবে বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকলের অন্য কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে–

১. বৃক্কে রক্তপ্রবাহ হ্রাস (Reduced blood flow to kidneys) : ডায়রিয়া, রক্তক্ষরণ, যেমন– রক্তবমি, সার্জিক্যাল অপারেশন, গর্ভপাত, শক, হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেইলিউর, রক্তে পানি ও লবণ জাতীয় পদার্থের অভাব, ভুল রক্ত দেয়া, যকৃত বৈকল্য, তীব্র অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া, তীব্র সংক্রমণ, তীব্র পানিশূন্যতা, মারাত্মকভাবে পুড়ে যাওয়া ইত্যাদি কারণে রক্তের প্রবাহ হ্রাস পায়। ফলে বৃক্ক পর্যাপ্ত মূত্র তৈরি করতে পারে না।

২. ক্ষতিগ্রস্ত বৃক্ক (Damage to kidneys) : হঠাৎ বৃক্ক প্রদাহ, ওষুধের বিষক্রিয়া (বিশেষত ব্যথানাশক ওষুধ; এছাড়াও বৃক্কের ইনফেকশনের কারণ হিসেবে ব্যাকটেরিয়াজনিত ইনফেকশন, ভাইরাস, হেপাটাইটিস, যক্ষা, ম্যালেরিয়া এদের ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াকে দায়ী করা হয়), সর্প দংশন, বৃক্ক সংক্রমণ, বৃক্কীয় রক্তনালির প্রদাহ, হিমোলাইটিক ইউরেনিক সিনড্রোম, বৃক্কীয় নালিতে রক্ত জমাট বাঁধা ইত্যাদি কারণে বৃক্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। ফলে বৃক্ক পর্যাপ্ত মূত্র তৈরি করতে পারে না।

৩. মূত্র নিঃসরণে বাধাগ্রস্ততা (Urine blockage in kidneys) : মূত্রনালির বাধাগ্রস্ততা, বৃক্ক ও মূত্রনালিতে পাথর, টিউমার, পুরুষের প্রোস্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি, মূত্রনালিতে ক্যান্সার, কোলন ক্যান্সার, সার্ভিক্স ক্যান্সার হওয়া ইত্যাদি কারণে মূত্র নিঃসরণ বাধাগ্রস্ত হয়। বৃক্ক মূত্র উৎপাদনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও মূত্র বৃক্ক থেকে মূত্রথলিতে পৌঁছাতে পারে না।

জন্মগত কারণেও কারও বৃক্কের কার্যকারিতা কম হতে পারে। খাবারে রাসায়নিক পদার্থ মিশানো, পানিতে অধিক হারে আর্সেনিক, বৃক্কের রোগের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়।

বৃক্ক বিকলের লক্ষণ

তাৎক্ষণিক বৃক্ক বিকলের লক্ষণগুলো হচ্ছে–

(i) অতি অল্প, ঘন ও গাঢ় মূত্র ত্যাগ বা মূত্র একেবারেই না হওয়া। (ii) রক্তে নাইট্রোজেনজাত বর্জ্যপদার্থ সঞ্চিত হওয়া। (iii) রক্তে তরলের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় হাত ও পায়ের পাতা, পা, গোড়ালি, মুখমণ্ডল ইত্যাদি ফুলে যায়, ফুসফুসে পানি জমার কারণে ঘনঘন শ্বাস নিতে হয়। (iv) পাঁজর ও কোমরের মাঝামাঝি দুপাশে ব্যথা (flank pain)। (v) ক্ষুধামন্দা, বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া। (vi) রক্তে পটাসিয়ামের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় পেশির অসারতা ও অস্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন হয়। (vii) রক্তে ফসফেটের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় চুলকানি, অস্থিরতা, পেশির খিচুনি ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। (viii) উচ্চ রক্তচাপ, রক্ত-মূত্র, রক্ত-পায়খানা হওয়া। (ix) প্রচুর পানি খেলেও মূত্রত্যাগ হয়না বা মূত্র মূত্রথলিতে জমা হয় না। (x) খাবারের অরুচি, তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব, অসংলগ্ন কথা বলা, অনেকক্ষণ ধরে হেচকি তোলা, মুখে ধাতব স্বাদ অনুভূত হওয়া।

বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকলে করণীয় (চিকিৎসা ও প্রতিকার)

বৃক্ক বিকল অত্যন্ত জটিল রোগ। তাৎক্ষণিক বৃক্ক বিকল আরও জটিল বিষয়। তাই এ রোগের প্রতিকার করতে হলে ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। লক্ষণের দু-একটি বৈশিষ্ট্য দেখেই খাদ্য ও পথ্য বিষয়ে নিজে থেকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ জীবনের জন্যে মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। শুধু তাই নয়, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে এ রোগের চিকিৎসার আরেক অর্থ হচ্ছে "অর্থ দিয়ে অনর্থ" ডেকে আনা।

বৃক্ক বিকলের প্রতিকারে বিশেষজ্ঞরা নিচে বর্ণিত পন্থার কথা উল্লেখ করেছেন–

(i) বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকলতার বিষয়টি বুঝতে পারা মাত্র বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা।

(ii) প্রাপ্তবয়স্ক লোকের রক্তচাপ নিয়মিত পরিমাপ করা উচিত। রক্তে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা, প্রস্রাবে অ্যালবুমিন আছে কিনা, ডায়াবেটিসের অবস্থা জানার জন্য নিয়মিত পরীক্ষা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। এজন্য আল্ট্রাসনোগ্রাফি, আই ভি ইউ, রেনোগ্রাম ইত্যাদি পরীক্ষা করতে হবে।

(iii) পরিসংখ্যানে দেখা যায় ৪৪% কিডনি রোগীই ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। আবার উচ্চ রক্তচাপের কারণে ২০-৪০% রোগীর কিডনি অকেজো হতে পারে। সুতরাং উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত এবং রক্তের ক্রিয়েটিনিন বছরে দু'বার পরীক্ষা করতে হবে।

(iv) নিয়ন্ত্রিত আহার করা অর্থাৎ কম প্রোটিন গ্রহণ (প্রতিদিন ৪০ গ্রাম এর বেশি নয়)। পনির, চকলেট, কমলা, মাশরুম ইত্যাদি নির্দিষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করা।

(v) দেহে দেহরস ও ইলেকট্রোলাইট এর ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(vi) বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকলের জটিলতা এড়াতে রোগীকে প্রয়োজনীয় ওষুধ সেবন করতে হবে। যেমন–বৃক্কের সংক্রমণ আরোগ্য লাভের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক সেবন, মূত্র তৈরির জন্য **ডাইইউরেট** সেবন, আয়ন ভারসাম্যতার জন্য ওষুধ সেবন ইত্যাদি।

(vii) পাতলা পায়খানা, বমি বা জ্বর হলে ঘন ঘন চিনির শরবত বা স্যালাইন পান করতে হবে; প্রয়োজন হলে আইভি স্যালাইন প্রয়োগ করতে হবে।

(viii) শরীর সুস্থ ও সচল রাখার জন্য নিয়মিত হাঁটা ও ব্যায়াম, খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

(ix) বৃক্ক নিঃসৃত হরমোন **এরিথ্রোপয়েটিন** এবং **ক্যালসিট্রাওল**-এর পরিমাণ প্রয়োজনীয় মাত্রায় দেহে রাখার ব্যবস্থা নেয়া যাতে রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ঠিক থাকে।

(x) বৃক্ক সম্পূর্ণ বিকল হলে শুধু ওষুধে রোগীকে বাঁচানো সম্ভব না হলে বৃক্ককে **ডায়ালাইসিস** প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা দেয়া, নয়তো সবশেষে **বৃক্ক প্রতিস্থাপন**-এর কথা চিন্তা করতে হবে।

বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল নির্ণয় (Acute Renal Failure Diagnosis)

রক্ত ও মূত্র পরীক্ষার মাধ্যমে বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল নির্ণয় করা হয়। নিম্নলিখিত কারণে পরীক্ষাগুলো করা হয়-

- বৃক্ক বিকল হলে রক্তে ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা বেড়ে যায়।
- বৃক্ক বিকল হলে রক্তে আয়নের মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় কিংবা কমে যায়।
- বৃক্ক বিকল হলে রক্তে লোহিত রক্তকণিকার পরিমাণ কমে যায়। এ অবস্থাকে **অ্যানিমিয়া** (anemia) বলে।
- বৃক্ক বিকল হলে মূত্রের পরিমাণ কমে যায় (<0.5 ml/kg/h for 6 hours)।

ডায়ালাইসিস (Dialysis)

ডায়ালাইসিস একটি **কৃত্রিম প্রক্রিয়া** যার মাধ্যমে বৃক্ক স্বাভাবিকভাবে কাজ না করলে রক্তে জমে যাওয়া বর্জ্যপদার্থ (ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, পটাসিয়াম) ও অপ্রয়োজনীয় পানি অপসারণ করা হয়। রক্তে রেচন বর্জ্যের বৃদ্ধি পাওয়াকে **অ্যাজোটিমিয়া** (azotimia) বলে। এ অবস্থায় মানুষ দেহে যে অসুস্থতা অনুভব করে তাকে বলে **ইউরেমিয়া** (uremia)। ১৯২৪ সালে জার্মান চিকিৎসক **জর্জ হাস** (George Hass) সর্বপ্রথম **ডায়ালাইসিস** প্রক্রিয়ার প্রবর্তন করেন। বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল চিকিৎসায় দুধরনের ডায়ালাইসিস করা হয়। যথা–**হিমোডায়ালাইসিস** ও **পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস**। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো–

ক. হিমোডায়ালাইসিস (Haemodialysis) : এ প্রক্রিয়ার শুরুতে কিছু যন্ত্রপাতি, দ্রবণ ও টিউবের সমন্বয়ে একটি **কৃত্রিম বৃক্ক** বা ডায়ালাইজার নির্মাণ করা হয়। কৃত্রিম বৃক্ক আসল বৃক্কের মতো একই নীতি অনুসরণ করে কাজ করে। সংক্ষেপে বলতে গেলে রক্তকে পাম্প করে শরীর থেকে বের করে বর্জ্যপদার্থ অপসারণের উদ্দেশে পরিস্রুত করে যেভাবে আবার দেহে ফেরত পাঠানো হয় তাকে **হিমোডায়ালাইসিস** বলে। পদ্ধতিটি নিম্নরূপ–

রোগীর দেহে একটি ধমনির ভিতর ফাঁপা নলাকার সূঁচ ঢোকানো হয়। এর নাম **ক্যাথেটার** (catheter)। এটি পিছন দিকে একটি নমনীয় টিউবের সাথে লাগানো থাকে। টিউবটি প্রথমে কিডনি মেশিনের সঙ্গে যুক্ত হয়, পরে একটি শিরায় এসে মিলিত হয়। বাহুর নিম্নপ্রান্ত বা পায়ে ক্যাথেটার লাগানো হয়। যাদের ঘন ঘন ডায়ালাইসিস হয় তাদের ক্ষেত্রে একটি ছোট টিউবসহ ক্যাথেটারটি স্থায়ীভাবে লাগিয়ে রাখা হয়।

পাম্পের সাহায্যে সযত্নে ধমনি থেকে রক্ত বের করে শিরার দিকে চালনা করা হয়। রক্তে হেপারিন (heparin) মেশানো হয় যাতে জমাট না বাঁধে। রক্ত ধীরে ধীরে কিডনি মেশিনের ডায়ালাইসিস **দ্রবণ** বা **ডায়ালাইসেট** (dialysate) এ শায়িত টিউবের ভিতর দিয়ে সংবহিত হয়। টিউবগুলো কৃত্রিম **আংশিক ভেদ্য** (partially permeable) ঝিল্লি-নির্মিত যা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় অতিক্ষুদ্র অণু ও পানিকে ব্যাপিত হওয়ার সুযোগ দেয়। রক্তকণিকা ও প্রোটিন অণু বড় হওয়ায় ব্যাপিত হতে পারে না।

চিত্র ৬.১১ : হিমোডায়ালাইসিস

রক্ত ও ডায়ালাইসেট (ডায়ালাইসিস দ্রবণ)-এর মধ্যে সমতা না আসা পর্যন্ত বিনিময় অব্যাহত থাকে। রক্তের অবাঞ্ছিত বস্তু বিশেষ করে ইউরিয়া ও অতিরিক্ত সোডিয়াম, পটাশিয়াম ইত্যাদি অপসারিত হয়, প্রয়োজনীয় বস্তু থেকে যায়।

প্রতি সপ্তাহে রোগীকে দুবার হিমোডায়ালাইসিসের সম্মুখীন হতে হয়। প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে ৪-৫ ঘন্টা সময় লাগে। প্রতিবার সদ্য বানানো ডায়ালাইসেট ব্যবহার করতে হয়।

ডায়ালাইসেটের উপাদান : হিমোডায়ালাইসিসের উদ্দেশে ডায়ালাইসিস টিউবগুলোকে যে দ্রবণে রাখা হয় তাকে ডায়ালাইসেট বলে। এর উপাদনগুলো হচ্ছে- সঠিক তাপমাত্রা (স্থির দেহ তাপমাত্রা); সঠিক আয়নিক ভারসাম্য, বিশেষ করে Na^+, K^+, Cl^-, Mg^{2+}, Ca^{2+} ও HCO_3^- (এসিটেট রূপে); অতিরিক্ত পুষ্টি, যেমন গ্লুকোজ; সঠিক pH ও বাফারিং ক্ষমতা (buffering capacity) ইত্যাদি।

শতর্কতা : রক্ত ডায়ালাইসেট দ্রবণে চালনা করার সময় কতকগুলো বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়। ডায়ালাইসেট দ্রবণকে সামান্য উষ্ণ করা হয় যাতে এর উষ্ণতা রক্তের উষ্ণতার সঙ্গে সমান হয়। তাছাড়া ডায়ালাইসেট দ্রবণ ও রক্তের চাপের যাতে তারতম্য সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা প্রয়োজন। চাপের তারতম্য ঘটলে অংশিকভেদ্য ঝিল্লি ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(খ) পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস (Peritonial dialysis) : কৃত্রিম ঝিল্লির পরিবর্তে দেহে অবস্থিত **পেরিটোনিয়াল ঝিল্লি** (পেরিটোনিয়াম)-কে ডায়ালাইসিং ঝিল্লি হিসেবে ব্যবহার করে বৃক্কের ডায়ালাইসিস প্রক্রিয়াকে **পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস** বলে। এ প্রক্রিয়ার শুরুতে রোগীর উদর প্রাচীরে একটি ছোট চেরাছিদ্র করে তার ভিতর দিয়ে সরু প্লাস্টিক টিউব উদরীয় গহ্বরে প্রবেশ করানো ও স্থায়ীভাবে রেখে দেয়া হয়। উদরীয় গহ্বরের প্রাচীরটি **পেরিটোনিয়াম** যা আংশিক ভেদ্য এবং ডায়ালাইসিং ঝিল্লি হিসেবে কাজ করে।

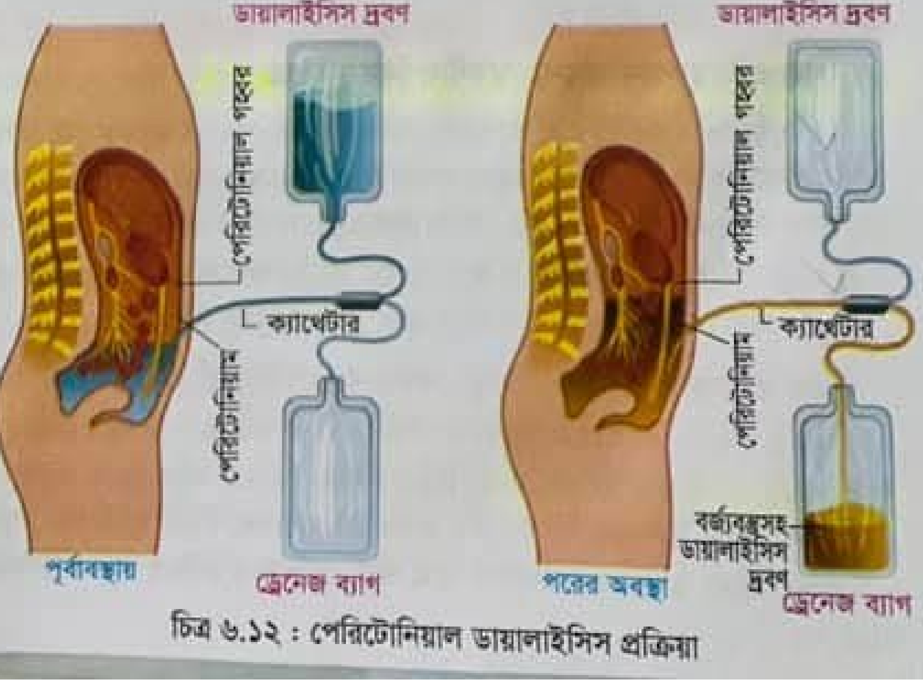

চিত্র ৬.১২ : পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস প্রক্রিয়া

প্লাস্টিক টিউবের ভিতর দিয়ে ডায়ালাইসেট উদরীয় গহ্বরে প্রবেশ করিয়ে কয়েক ঘন্টা রেখে দেয়া হয়। ডায়ালাইসেট ও উদরের বাকি অংশের টিস্যু-তরলের মধ্যে উপাদানের বিনিময় ঘটে। দিনে ৩-৪ বার ডায়ালাইসেট প্রতিস্থাপন করা যায়।

বৃক্ক প্রতিস্থাপন (Kidney Transplant)

বৃক্ক বিকলের দীর্ঘকালীন সমাধানে রোগীর দেহে ভিন্ন ব্যক্তির সুস্থ ও সঠিক বৃক্ক স্থাপনকে **বৃক্ক প্রতিস্থাপন** বলে। বৃক্ক বিকলের চিকিৎসায় ডায়ালাইসিস পদ্ধতি সাময়িক সমাধান হতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যয় সাপেক্ষ মনে হলেও দীর্ঘকালীন হিসেবে বৃক্ক প্রতিস্থাপনই ভালো পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হচ্ছে। স্থায়ীভাবে নষ্ট বৃক্কের বিকল্প হিসেবে একটি সুস্থ বৃক্ক প্রতিস্থাপনই স্থায়ী সমাধান হতে পারে।

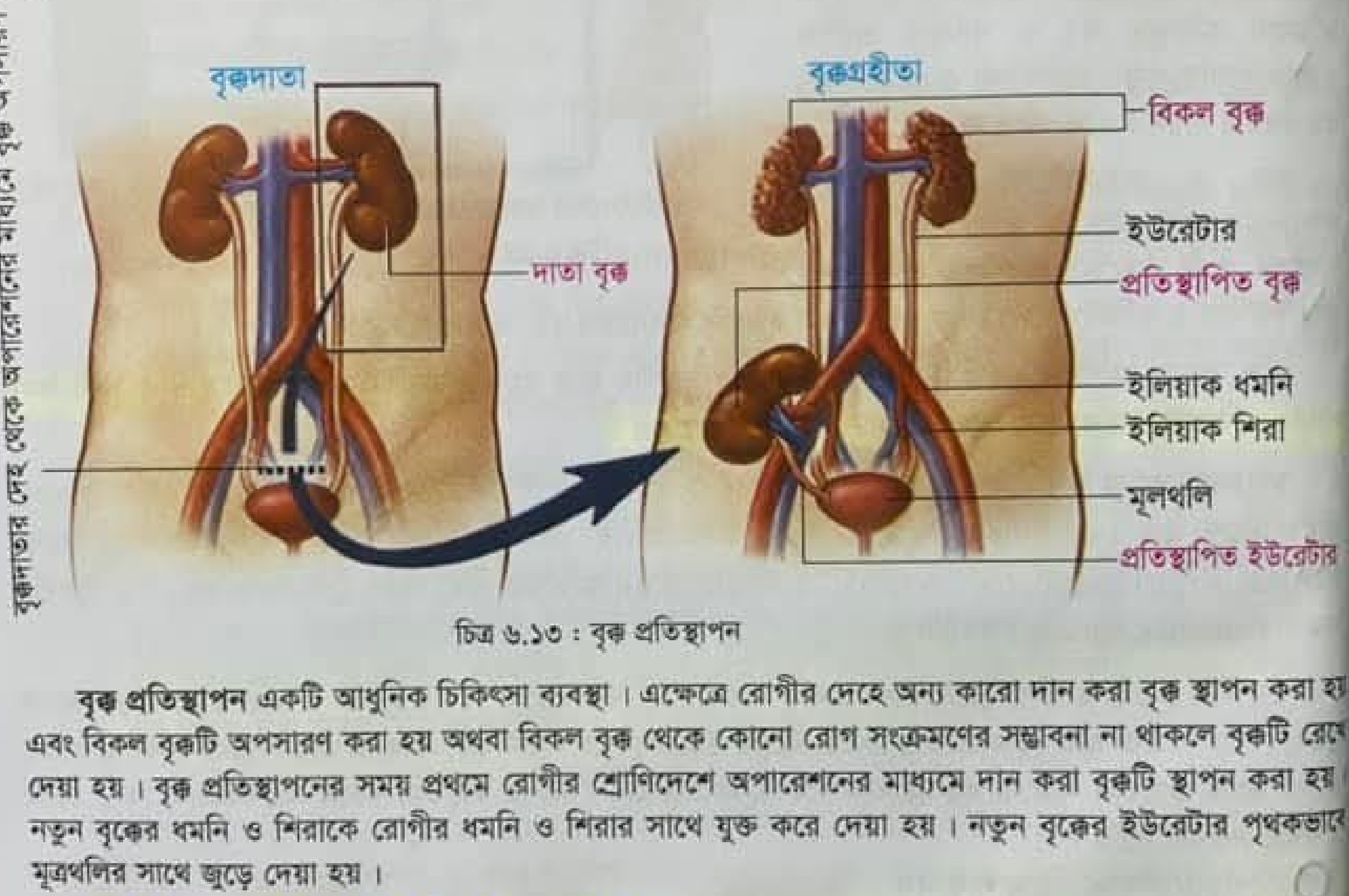

চিত্র ৬.১৩ : বৃক্ক প্রতিস্থাপন

বৃক্ক প্রতিস্থাপন একটি আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে রোগীর দেহে অন্য কারো দান করা বৃক্ক স্থাপন করা হয় এবং বিকল বৃক্কটি অপসারণ করা হয় অথবা বিকল বৃক্ক থেকে কোনো রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা না থাকলে বৃক্কটি রেখে দেয়া হয়। বৃক্ক প্রতিস্থাপনের সময় প্রথমে রোগীর শ্রোণিদেশে অপারেশনের মাধ্যমে দান করা বৃক্কটি স্থাপন করা হয়। নতুন বৃক্কের ধমনি ও শিরাকে রোগীর ধমনি ও শিরার সাথে যুক্ত করে দেয়া হয়। নতুন বৃক্কের ইউরেটার পৃথকভাবে মূত্রথলির সাথে জুড়ে দেয়া হয়।

বৃক্ক প্রতিস্থাপনে অবশ্য স্মরণীয় বিষয় হচ্ছে–

১. বৃক্কদাতা (অনাত্মীয় বা আত্মীয়) যেই হোক না কেন তার দেহ থেকে সংগ্রহের ঠিক ৪৮ ঘন্টার মধ্যে রোগীর দেহে স্থাপন করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে যতখানি সময় বৃক্কটি বাইরে থাকে ততক্ষণ বৃক্কের উপর দিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে ঠান্ডা স্যালাইন দ্রবণ প্রবাহিত করা হয়। দাতা মৃত হলে সদ্যমৃত দাতার দেহ থেকে বৃক্ক সংগ্রহ করতে হবে।

২. সংগৃহীত বৃক্কটি সুস্থ হতে হবে (HIV বা অন্যান্য সংক্রমণমুক্ত হতে হবে)।

৩. বৃক্কদাতা ও গ্রহীতার ব্লাড গ্রুপ এবং টিস্যুর ধরণ এক হতে হবে।

বৃক্ক প্রতিস্থাপন-পরবর্তী যত্ন কেমন হওয়া উচিত ?

বৃক্ক প্রতিস্থাপন পরবর্তী যত্নের ওপর নির্ভর করে তা কত দিন কার্যকর থাকবে। প্রতিস্থাপিত বৃক্কের সঠিক যত্ন নিলে ১৫-২ বছর কোনো সমস্যা ছাড়াই সেবা দেবে। নিয়মিত শৃঙ্খলার সঙ্গে ওষুধ সেবন, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপসহ অন্যান্য রোগ, যা বৃক্ক দুর্বল করতে পারে, সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা ও নিয়মিত ফলোআপ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খাবারে পরিমিত লবণ, পরিমিত পানি পা ও চিন্তামুক্ত জীবন যাপন করা; নিয়মিত মাস্ক পরা, বেশি ভিড় এড়িয়ে চলা ও চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ সেবন ক উচিত নয়।

হরমোনাল ক্রিয়া (Hormonal Activities)

উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসি শারীরবিজ্ঞানী **ক্লড বার্নার্ড** (Claude Bernard) সর্বপ্রথম প্রাণিদেহের অন্তঃস্থ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার কৌশলের উল্লেখ করেন। পরবর্তীতে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে মানবদেহে মূত্রের ঘনত্ব, রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা ও রক্তের পিএইচ নিয়ন্ত্রণে মূল কার্যকর উপাদান হিসেবে **হরমোন** কিভাবে জটিল ও সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করে চলেছে বিজ্ঞানীরা তা উদ্ভাবন করেছেন। নিচে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

মূত্রের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ (Control of Urine Concentration)

আহারের সঙ্গে পানি গ্রহণ এবং ঘাম, মল-মূত্র ত্যাগ ইত্যাদির মাধ্যমে পানি ত্যাগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেহ রক্তের **দ্রব** (solute)-এর স্থিতাবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। এ প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্টভাবে প্রভাব ফেলে অ্যান্টিডাইইউরেটিক হরমোন (ADH)। বিপুল পরিমাণ কম ঘন মূত্র উৎপাদন প্রক্রিয়া **ডাইইউরেসিস** (diuresis) এবং এর বিপরীত প্রক্রিয়াটি স্বভাবতই **অ্যান্টিডাইইউরেসিস** (antidiuresis) নামে পরিচিত। ADH কার্যগতভাবে অ্যান্টিডাইইউরেটিক, অতএব বেশি ঘন মূত্র উৎপন্নে ভূমিকা পালন করে। ADH একটি পেপটাইড হরমোন। মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে উৎপন্ন হয়ে ADH পিটুইটারি গ্রন্থির পশ্চাৎখন্ডে প্রবেশ করে। রক্তে পানির পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে কমে গেলে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত অসমোরিসেপ্টর কোষগুলো উত্তেজিত হয় এবং ADH উৎপন্ন করে। নিউরোনের অ্যাক্সন বেয়ে ADH পশ্চাৎ পিটুইটারি গ্রন্থিতে প্রবেশ করে এবং রক্তস্রোতে ক্ষরিত হয়। ক্ষরিত হরমোন বৃক্কসহ দেহের সব অংশে বাহিত হয়।

বৃক্কে নেফ্রনগুলোর সংগ্রাহী নালির কোষঝিল্লিতে অবস্থিত গ্রাহক অণু ADH গ্রহণ করে, ফলে ঝিল্লির পানিভেদ্যতা বেড়ে যায়। গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট থেকে তখন পানি অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় বৃক্কের সংগ্রাহী নালিতে পুনঃশোষিত হয়। সংগ্রাহী নালিতে তরল বেশ ঘন হয়ে যায় এবং ব্যক্তি অল্প পরিমাণ অতিঘন মূত্র উৎপন্ন করে।

অন্যদিকে, রক্তে পানির পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে গেলে হাইপোথ্যালামাসের অসমোরিসেপ্টর কোষগুলো তেমন উত্তেজিত হয় না এবং অতি অল্প পরিমাণ ADH ক্ষরিত হয়। তখন সংগ্রাহী নালির কোষগুলো প্রায় পানি-অভেদ্য হয়ে যায়, ফলে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট থেকে পানি পুনঃশোষণ বন্ধ থাকে। সংগ্রাহী নালিতে তখন ফিল্ট্রেট অনেক তরল হয়ে যায় এবং ব্যক্তি বেশি পরিমাণ অতি তরল মূত্র উৎপন্ন করে। দেহে পানির সমতা ফিরে না আসা পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত থাকে। রেনাল ক্যাপসুলে পরিস্রাবণ প্রক্রিয়া সবসময় অব্যাহত থাকে। পানির অভাবে রক্তরসের গাঢ়তা বাড়লে কিংবা পরিমাণ কমে গেলে অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স থেকে ক্ষরিত **অ্যালডোস্টেরন্** (aldosterone) হরমোন মূত্রে সোডিয়াম আয়নের রেচন কমিয়ে পরোক্ষভাবে পানির রেচনও হ্রাস করে।

রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ (Control of Sodium in Blood)

রক্তের প্লাজমায় সোডিয়ামের মাত্রা স্থির রাখতে যে হরমোনটি নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে সেটি হচ্ছে **অ্যালডোস্টেরন** (aldosterone)। এ হরমোনও পানি পুনঃশোষণকে প্রভাবিত করে। অ্যালডোস্টেরন ক্ষরিত হয় অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির কর্টেক্স (বহিঃস্থ) অঞ্চল থেকে।

রক্তে সোডিয়াম কম হলে অভিস্রবণের মাধ্যমে কম পানি প্রবেশ করে, তাই রক্তের আয়তন কমে যায়। এর ফলে রক্তচাপও হ্রাস পায়। চাপ ও আয়তন হ্রাস পেলে ডিস্টাল বা দূরবর্তী প্যাঁচানো নালিকা ও অ্যাফারেন্ট ধমনিকার (afferent arteriole) মাঝখানে অবস্থিত **জাক্সটাগ্লোমেরুলার কমপ্লেক্স** (juxtaglomerular complex) নামে একগুচ্ছ সংবেদী কোষ উদ্দীপ্ত হয় এবং রেনিন (renin) এনজাইম ক্ষরণ করে। যকৃত থেকে উৎপন্ন ও প্লাজমায় অবস্থিত একধরনের প্রোটিনকে রেনিন সক্রিয় করে অ্যানজিওটেনসিন (angeotensin) হরমোনে পরিণত করে। এ হরমোন অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স থেকে অ্যালডোস্টেরন ক্ষরণকে উদ্দীপ্ত করে। অ্যালডোস্টেরন রক্তবাহিত হয়ে বৃক্কের ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকায় পৌঁছায় এবং নালিকার কোষগুলোতে সোডিয়াম-পটাসিয়াম পাম্প (sodium-potassium pump)-কে উদ্দীপ্ত করে। ফলে দূরবর্তী প্যাঁচানো নালিকা থেকে সোডিয়াম আয়ন বেরিয়ে নালিকার চারপাশের কৈশিকজালিকায় প্রবেশ করে। অন্যদিকে, পটাসিয়াম আয়ন প্রবেশ করে কৈশিকজালিকা থেকে দূরবর্তী প্যাঁচানো

নালিকায়। অ্যালডোস্টেরন অন্ত্রে সোডিয়াম শোষণকে এবং ঘামে কম সোডিয়াম ত্যাগকে উদ্দীপ্ত করে। এ দুই প্রক্রিয়ার ফলে রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা বেড়ে যায়। এ কারণে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় রক্তে প্রচুর পানি প্রবেশ করে রক্তের আয়তন ও চাপ উভয়ই বেড়ে যায়।

রক্তের পিএইচ নিয়ন্ত্রণ (Control of Blood p^H)

পিএইচ (p^H) হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়ন ঘনত্বের একটি পরিমাপক। নিরপেক্ষ p^H হচ্ছে 7.0, এসিড p^H হয় 7-এর নিচে, আর ক্ষারীয় p^H হচ্ছে 7-এর উপরে। কিছু রাসায়নিক পদার্থ দ্রবণে p^H-এর পরিবর্তনকে প্রতিহত করতে সক্ষম। এসব পদার্থকে বলে বাফার (buffers)। রক্তের প্লাজমার স্বাভাবিক p^H হচ্ছে 7.4। এ মাত্রা যথাসম্ভব বজায় না রাখলে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে।

দেহে ক্ষারের চেয়ে এসিড বেশি উৎপন্ন হয়। অতএব, এসিডিটি কমানোর বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী। এসিডিটি বেড়ে যাওয়ার একটি কারণ হচ্ছে কোষীয় শ্বসনে উৎপন্ন CO_2। এটি দ্রবীভূত হয়ে H_2CO_3 (কার্বনিক এসিড) নামে একটি দুর্বল এসিডে পরিণত হয়। এটি ভেঙ্গে H^+ ও HCO_3^- (হাইড্রোজেন কার্বনেট আয়ন) উৎপন্ন হয়। CO_2 এর ঘনত্ব বেশি হয়ে গেলে পরিত্রাণ পেতে প্রতিবর্ত সাড়া হিসেবে শ্বাসপ্রশ্বাসের হার বেড়ে যায়। HCO_3^- বাফার হিসেবে কাজ করতে পারে কারণ H^+ এর ঘনত্ব বেশি হয়ে গেলে এগুলো H_2CO_3 গঠন করে।

রক্তে HCO_3^- ও ফসফেট বাফার অতিরিক্ত H^+ প্রতিরোধে সাহায্য করে। এ কারণে রক্তের p^H কমে না। প্লাজমার স্বাভাবিক p^H এ যেন পরিবর্তন না ঘটে সে উদ্দেশে নেফ্রনের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী প্যাঁচানো নালিকা এবং সংগ্রাহী নালি নিম্নোক্ত দুভাবে কাজ করে।

১. রক্ত অতিএসিডিক হতে শুরু করলে দূরবর্তী নালিকা ও সংগ্রাহী নালির কোষগুলোর সাহায্যে রক্ত থেকে H^+ সক্রিয় পরিবহন (active transport)-এর মাধ্যমে নালিকাতে পরিবাহিত হয়। CO_2 যদি H^+ এর উৎস হয়ে থাকে তাহলে HCO_3^- ও উৎপন্ন হয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রক্তে ফেরত যাবে। p^H বেড়ে গেলে বিপরীত ঘটনা ঘটবে। এসব পরিবর্তনের কারণে মূত্রের p^H 4.5 – 8.5 পর্যন্ত হতে পারে।

২. p^H কমে গেলেও বৃক্ককোষে অ্যামোনিয়াম বেইস (base) আয়ন (NH_4^+) সৃষ্টিতে উদ্দীপ্ত হয়। NH_4^+ এসিডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৃক্কে বাহিত হয় এবং অ্যামোনিয়াম লবণ হিসেবে রেচিত হয়।

ব্যবহারিক

বৃক্কের অনুচ্ছেদের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ

বৃক্কের অনুচ্ছেদের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণে নিচে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যাবে।

১. বাইরে কর্টেক্স ও ভিতরে মেডুলা-এ দুটি অংশ নিয়ে গঠিত।

২. এতে অসংখ্য প্যাঁচানো নালিকা বা নেফ্রন অবস্থিত।

৩. প্রত্যেক নেফ্রনের অগ্রভাগে একটি করে পেয়ালার মতো গঠন রয়েছে। এর নাম বোম্যানস ক্যাপসুল। পেয়ালার অভ্যন্তরে গ্লোমেরুলাস নামক একগুচ্ছ কৈশিকনালি রয়েছে।

৪. নেফ্রনের ফাঁকে ফাঁকে মেডুলারি রশ্মি অবস্থিত।

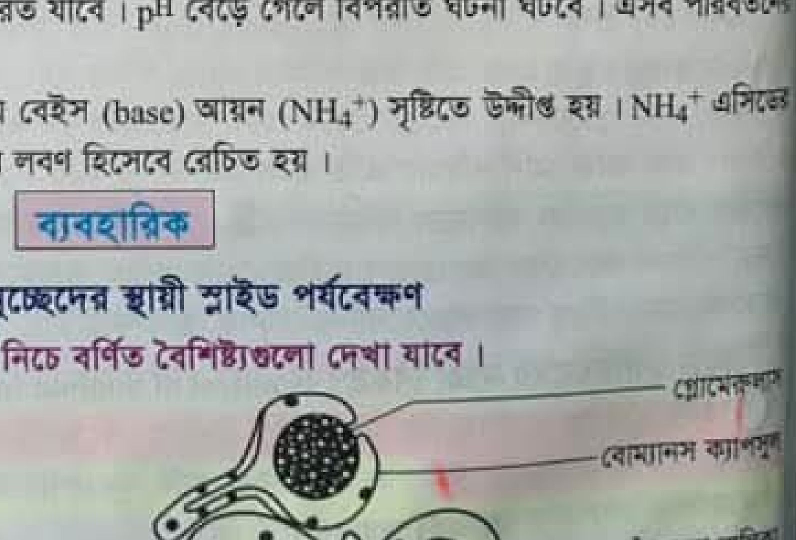

চিত্র ৬.১৪ : বৃক্কের অনুচ্ছেদ (অংশবিশেষ)

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ (Recapitulation)

১. কোষীয় বিপাকের (অপচিতিমূলক) ফলে সৃষ্ট নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্যপদার্থ দেহ থেকে নিষ্কাশিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে **রেচন** (excretion) বলে।

২. আমিষের বিপাকের ফলে প্রাণিদেহে নাইট্রোজেনঘটিত যেসব বর্জ্যপদার্থ সৃষ্টি হয় তাকে **রেচন পদার্থ** বলে। মানুষের প্রধান রেচনপদার্থ হলো– অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ইত্যাদি।

৩. মানুষের বৃক্কের সংখ্যা দুটি। ডান বৃক্ক বাম বৃক্কের সামান্য নিচে অবস্থিত কারণ ডান দিকের যকৃত বৃক্ককে নিচে ঠেলে রাখে।

৪. বৃক্কের গঠন ও কাজের একককে **নেফ্রন** বলে। মানুষের প্রতিটি বৃক্কে ১০ থেকে ১২ লক্ষ নেফ্রন থাকে।

৫. বৃক্কের কর্টেক্স অঞ্চলে অবস্থিত 0.2 মিলিমিটার ব্যাসের গোলাকার অংশকে **রেনাল করপাসল** বা **ম্যালপিজিয়ান বডি** বলে।

৬. রেনাল ধমনি থেকে সৃষ্ট ক্ষুদ্র **অন্তর্বাহী ধমনিকা** নেফ্রনের বোম্যানস ক্যাপসুলে প্রবেশ করে যে কৈশিকজালিকাসমৃদ্ধ জটিল গঠন সৃষ্টি করে তার নাম **গ্লোমেরুলাস**।

৭. নেফ্রনের নিকটবর্তী প্যাঁচানো নালিকার শেষ প্রান্ত সোজা হয়ে বৃক্কের মেডুলা অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং একটি U আকৃতির ফাঁস বা লুপ গঠন করে পুনরায় কর্টেক্স অঞ্চলে ফিরে আসে। আবিষ্কারক জার্মান চিকিৎসক Jakob Henle-র নামানুসারে একে **হেনলির লুপ** বলা হয়।

৮. নেফ্রনের রেনাল করপাসল বা ম্যালপিজিয়ান বডিতে যে পদ্ধতিতে রক্ত থেকে পানি, রেচন বর্জ্য ও অন্যান্য পদার্থ পরিস্রুত হয় তাকে **অতিপরিস্রাবণ** বা **আল্ট্রাফিল্ট্রেশন** বলে।

৯. বোম্যানস ক্যাপসুল এ জমাকৃত পরিস্রুত তরল গ্লোমেরুলারস ফিলট্রেটে বিদ্যমান প্রয়োজনীয় বস্তু যেমন– পানি, গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, ভিটামিন, খনিজ লবণ, আয়ন প্রভৃতি রক্তের মাধ্যমে পুনঃশোষণকে **নির্বাচিত পুনঃশোষণ** বলে।

১০. দেহে অব্যবহৃত অ্যামিনো এসিড বিশ্লিষ্ট হয়ে যে **অ্যামোনিয়া** তৈরি করে তা বিষাক্ত। অ্যামোনিয়া CO_2 এর সাথে মিলিত হয়ে যকৃতে **অরনিথিন চক্রের** মাধ্যমে কম ক্ষতিকারক ও পানিতে দ্রবণীয় **ইউরিয়ায়** পরিণত হয়। ইউরিয়া প্লাজমায় (রক্তরসে) অবস্থান করে এবং সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে বৃক্কে পৌছে।

১১. যেসব প্রাণীর রেচনে ইউরিয়ার পরিমাণ সর্বাধিক থাকে তাদের **ইউরিওটেলিক প্রাণী** বলে। যেমন-মানুষ।

১২. নেফ্রনের রেনাল টিউবিউলসে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট এর নির্বাচিত পুনঃশোষণের পর যে খড় বর্ণের, তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত ও অম্লধর্মী তরল রেচনবর্জ্য মূত্রথলিতে জমা হয় তাকে **মূত্র** বলে। **ইউরোক্রোম** নামক রঞ্জক পদার্থ থাকায় মূত্রের রঙ খড় বর্ণের (হালকা হলুদ) হয়।

১৩. বৃক্ক দেহের পানি ও সোডিয়াম, পটাসিয়াম এবং ক্লোরাইড আয়নের মধ্যে আন্তঃসাম্য রক্ষা তথা **অসমোরেগুলেশন** (osmoregulation)- এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেহস্থ তরল পদার্থ এবং দ্রবীভূত লবণসমূহের ঘনত্বের উপর **অভিস্রবণ** প্রক্রিয়া নির্ভর করে। মূত্রের সঠিক পরিমাণ বজায় রেখে বৃক্ক দেহ তরলের পরিমাণ ও অভিস্রবণিক চাপকে নিয়ন্ত্রণ করে।

১৪. একজন সুস্থ মানুষের হঠাৎ করে মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বৃক্কের কার্যক্রম কমে গেলে অথবা বন্ধ হয়ে গেলে তাকে **বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল** বা **অ্যাকিউট রেনাল ফেইলিওর** বলে। বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকলে মূত্রের পরিমাণ কমে যায় এবং রক্তে ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়।

১৫. বৃক্ক সম্পূর্ণভাবে অকেজো হওয়ার পর শরীরে জমে থাকা বর্জ্য (ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, পটাসিয়াম) পরিশোধিত করার নাম **ডায়ালাইসিস**।

১৬. পশ্চাৎ পিটুইটারি থেকে ADH ক্ষরণ কমে গেলে বা বন্ধ হয়ে গেলে বৃক্ক নালিকায় পানি শোষণ ব্যহত হয় এবং মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, ফলে অধিক পরিমাণ মূত্র ত্যাগ ঘটে। এ অবস্থাকে **বহুমূত্র** বা **ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস** বলে। উল্লেখ্য এ রোগে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ে না এবং মূত্রে শর্করা নির্গত হয় না। **ইনসুলিন** হরমোনের অভাবে যে বহুমূত্র হয় তাকে **মধুমেহ** বা **ডায়াবেটিস মেলিটাস** বলে। এতে মূত্রের সাথে শর্করা নির্গত হয়।